তৃতীয় শ্রেণী—পরহেযগার পুণ্যবানগণ। তাঁহারা প্রশংসাকারী এবং নিন্দুক উভয়কে আন্তরিকভাবে ও বাক্যে বা ব্যবহারে সমান মনে করিয়া থাকেন। তাঁহারা নিন্দাকারীর প্রতি অসন্তুষ্ট হন না এবং প্রশংসাকারীকেও অধিক প্রিয় বলিয়া গ্রহণ করেন না। অপরের প্রশংসা বা নিন্দা কোনটার প্রতিই তাঁহাদের লক্ষ্য নাই। তাঁহারা অত্যন্ত উচ্চ শ্রেণীর মানব।

সাধারণ আবিদগণের কেহ কেহ মনে করেন যে, তাঁহারা উল্লিখিত উন্নত মানব শ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা ভ্রমে নিপতিত রহিয়াছেন। তদ্রূপ নির্বিকারচিত্ত ও মানসিক উন্নতির নিদর্শনাবলী এই- (১) প্রশংসাকারী নিকটে উপবেশন করিলে মনে যেমন ভার বোধ হয় না নিন্দুকও সেইরূপ পার্শ্বে উপবেশন করিলে অন্তরে ভার বোধ না হওয়া; (২) প্রশংসাকারী ও নিন্দুক উভয়েই কোন কার্যে সাহায্য প্রার্থনা করিলে উভয়কেই সমানভাবে সাহায্য করা এবং প্রশংসাকারীকে সাহায্য প্রদানকালে যেরূপ আগ্রহ ও প্রফুল্লতা পরিলক্ষিত হয়, নিন্দুকের সাহায্য দান কালে ইহার ব্যতিক্রম না হওয়া; (৩) প্রশংসাকারীর সহিত বহুদিন যাবত সাক্ষাত না ঘটিলে মন যেমন তাহার সাক্ষাত লাভের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠে, তদ্রূপ নিন্দুকের সাক্ষাত লাভের জন্যও উৎসুক হইয়া থাকা; (৪) প্রশংসাকারী ও নিন্দুক উভয়ের মৃত্যুতে তুল্য পরিমাণে বিচ্ছেদ-যাতনা অনুভব করা; (৫) প্রশংসাকারীকে কেহ কষ্ট দিলে মন যেরূপ দুঃখিত হয়, নিন্দুককে কেহ যাতনা দিলেও মন তদ্রূপ দুঃখিত হওয়া এবং (৬) নিন্দুক কোন গর্হিত কার্য করিলে ইহা অসহনীয় ও প্রশংসাকারী তদ্রূপ অন্যায় করিলে ঘুষ বলিয়া মনে না হওয়া। এইরূপ নির্বিকার চিত্ত ও সমভাব রক্ষা করা নিতান্ত দুরূহ ব্যাপার।

উল্লিখিতরূপ মানসিক অবস্থা লাভে অসমর্থ হইয়া যদি কোন আবিদ গর্বিত হইয়া বলে- 'নিন্দুক আমার নিন্দা করিয়া পাপী হইতেছে বলিয়াই আমি তৎপ্রতি ক্রুদ্ধ হইতেছি"- তবে ইহা শয়তানের প্রতারণা ব্যতীত আর কিছুই নহে। কারণ, যাহারা মহাপাপে লিপ্ত রহিয়াছে এবং অপরের নিন্দা করিয়া ফিরিতেছে, বর্তমানকালে এইরূপ লোক বিরল নহে। কিন্তু উহাতে সে ক্রোধ প্রকাশ করিতেছে না, শুধু স্বীয় নিন্দা শ্রবণে সে ক্রুদ্ধ হইতেছে। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, কেবল অহংকার হইতেই এইরূপ ক্রোধের সঞ্চার হইয়াছে, অপরকে পাপ হইতে রক্ষার অভিপ্রায়রূপ ধর্মভাব হইতে ইহার উদ্ভব হয় নাই। মূর্খ আবিদগণের পক্ষে এইরূপ সূক্ষ্ম বিষয় উপলব্ধি করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য।

চতুর্থ শ্রেণী—মহাসাধক সিদ্দীকগণ। তাঁহারা প্রশংসাকারীকে শত্রু বলিয়া জানেন এবং নিন্দুককে বন্ধু জ্ঞান করেন। কারণ, অপরের নিন্দা হইতে তাঁহারা তিন প্রকার উপকার পাইয়া থাকেন। **প্রথম**—তাঁহার নিন্দুকের নিকট হইতে স্বীয় দোষ শ্রবণ করিয়া সতর্ক হন। **দ্বিতীয়**—ইহাতে নিন্দুকের পুণ্যসমূহ তাঁহারা পাইয়া থাকেন। **তৃতীয়**- নিন্দাকারী যে দোষের উল্লেখ করিতেছে, ইহা হইতে বা তদ্রূপ অন্য কোন দোষ হইতে নিষ্কলঙ্ক থাকিতে তাহারা প্রলুব্ধ ও সচেষ্ট হইয়া উঠেন।

রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "যে ব্যক্তি (নিরবচ্ছিন্ন) রোযা রাখে, (রাত্রি জাগরণ করিয়া) নামায পড়ে এবং দরবেশী পোশাক পরিধান করে, অথচ তাহার অন্তর দুনিয়া হইতে নির্মোহ হয় নাই, তবে ইহা গভীর পরিতাপের বিষয়।" ইহা যদি বাস্তবিকই রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের উক্তি হইয়া থাকে তবে ব্যাপার বড় জটিল। কারণ, এই চতুর্থ শ্রেণীতে উন্নীত হওয়াই মানুষের পক্ষে নিতান্ত দুষ্কর। এমন কি, দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হওয়াও সহজসাধ্য নহে, অর্থাৎ প্রশংসাকারী ও নিন্দুককে আন্তরিকভাবে সমান মনে না করিলেও বাক্যে বা ব্যবহারে উভয়কে তুল্যরূপ জ্ঞান করাই দুঃসাধ্য। কার্যে বা ব্যবহারে মানুষ সাধারণত প্রশংসাকারীর প্রতিই অধিক আকৃষ্ট হইয়া পড়িতে দেখা যায়। অধিকাংশ লোকই সিদ্দীকগণের সেই চরম উন্নত সোপানে পৌঁছিতে পারে না; তবে যে ব্যক্তি স্বীয় প্রবৃত্তির সহিত অবিরাম সংগ্রাম করিয়া চলিয়াছেন এবং এইরূপে নিজেই নিজের শত্রু হইয়া পড়িয়াছেন, কেবল তিনিই স্বীয় নিন্দা শ্রবণে আনন্দিত হইতে পারেন এবং নিন্দুককে নিপুণ ও বুদ্ধিমান বলিয়া গণ্য করিতে সমর্থ হন। এইরূপ উন্নত শ্রেণীর লোকের সংখ্যা নিতান্ত বিরল। সিদ্দীকগণের চূড়ান্ত শেষ শ্রেণীতে উপনীত হওয়া ত দূরের কথা, বরং আজীবন কঠোর সাধনার পর প্রশংসা ও নিন্দাকে সর্বতোভাবে তুল্য জ্ঞান করত নির্বিকার চিত্ত লাভ করাও অধিকাংশ সাধকের পক্ষে নিতান্ত দুষ্কর হইয়া উঠে।

প্রিয় পাঠক, জানিয়া রাখ, উক্তরূপ নির্বিকার চিত্ত লাভের পরও এই কারণে আশঙ্কা থাকিয়া যায় যে, সে যদি প্রশংসা ও নিন্দাকে সর্বতোভাবে সমান জ্ঞান করিতে না পারে, তবে প্রশংসা-লিপ্সু তাহার হৃদয়ে প্রবল হইয়া উঠে এবং তখনই মানুষ প্রশংসা লাভের নিমিত্ত নানারূপ প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। এই প্রকারে প্রতারণার অন্তরালে রিয়া প্রবেশ করাও অসম্ভব নহে। এমনকি পাপকর্ম দ্বারাও যদি প্রশংসা লাভ করা সম্ভবপর হয়, তবে হয়ত সে তাহাই করিয়া বসিবে। উপরিউক্ত হাদীসে রাসূলাল্লাহ্ (সা) যে রোযাদার নামাযী ব্যক্তির জন্য অনুশোচনা করিয়াছেন, ইহা বোধ হয় এই কারণেই হইয়াছে যে, সংসারাসক্তি এবং প্রশংসা প্রীতির মূল

শিকড় অন্তর হইতে উৎপাটন করিতে না পারিলে মানব অতি তাড়াতাড়ি পাপে নিমজ্জিত হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু নিছক নিন্দাকে ঘৃণা করা ও সত্য প্রশংসাকে ভালবাসা হইতে অপর কোন আপদ ও অনিষ্টের উদ্ভব না হইলে উহাকে হারাম বলা চলে না। তবে ইহাও জানিয়া রাখা উচিত যে নিন্দা-বিরাগ ও প্রশংসা-প্রীতি হইতে আপদ ও অনিষ্টের উদ্ভব না হইয়াই পারে না। মানবের অধিকাংশ পাপ প্রশংসা-প্রীতি ও নিন্দা-বিরাগ হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। মানুষ সাধারণত স্বীয় বাক্যে ও কর্মে অপরের মনোরঞ্জনের জন্য উদ্‌গ্রীব। তাহারা যাহা কিছু করে কেবল অপরের মনস্তুষ্টির জন্য করিয়া থাকে (অথচ তাহার প্রতিটি বাক্য ও কর্ম একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যেই হওয়া উচিত ছিল।) মানুষের এইরূপ পরমনোরঞ্জন-ব্যাকুলতা প্রবল হইয়া উঠিলে ইহার প্রভাবে সে নানারূপ অবৈধ ও অসঙ্গত কর্মে প্রবৃত্ত হয়। নতুবা রিয়ার ভাব না থাকিলে অপরের মনস্তুষ্টির বিধান হারাম নহে।

অষ্টম অধ্যায়

রিয়া ও ইহা হইতে অব্যাহতির উপায়

প্রিয় পাঠক, জানিয়া রাখ, আল্লাহ্‌র ইবাদত কার্যে রিয়া (ইবাদত কার্যে লোক দেখানো ভাব) মহাপাপ এবং প্রকারান্তরে ইহা শিরক অর্থাৎ অংশীবাদের তুল্য। পুণ্যবান লোকদের অন্তরে রিয়া অপেক্ষা মারাত্মক ব্যাধি আর নাই। ইবাদতকালে যদি মনে এইভাব থাকে যে, ইহা দেখিয়া ইবাদতকারীর সাধুতার প্রতি লোকে বিশ্বাস স্থাপন করিবে, তবে মনে করিবে তাহার হৃদয় অতি কঠিন রোগে আক্রান্ত। ইবাদতে অপরের ভক্তি আকর্ষণের উদ্দেশ্য থাকিলে উহা আল্লাহ্‌র ইবাদতে পরিগণিত হয় না; বরং তখন ইহা মানব পূজা বলিয়া গণ্য হয়। আর ইবাদত-কার্যে লোকের ভক্তি আকর্ষণ ও আল্লাহ্‌র আরাধনা উভয় উদ্দেশ্য হইলে শিরক এবং আল্লাহ্‌র সাথে অপরকে শরীক করিয়া তাহারও ইবাদত করা হইল। ইবাদত সম্বন্ধেই আল্লাহ্ বলেন-

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَاءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَّلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖ اَحَدًا -

"অনন্তর যে ব্যক্তি স্বীয় প্রভুর দর্শন লাভের আশা রাখে তাহার উচিত যে, সৎ কাজ করে এবং আপন প্রভুর ইবাদতে কাহাকেও শরীক না করে।" (সূরা কাহাফ, ১২ রুকু, ১৬ পারা)। অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন-

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلٰوتِهِمْ سَاهُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ -

"অনন্তর নিরতিশয় অনিষ্ট রহিয়াছে এমন নামাযীদিগের জন্য যাহারা নিজেদের নামাযকে ভুলিয়া থাকে (অর্থাৎ নামায পড়েই না), যাহারা এইরূপ যে (কোন সময় নামায পড়িলেও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য পড়ে না-শুধু) রিয়াকারী (অর্থাৎ লোকের নিকট নামায পড়ার ভান) করে (মাত্র)।" (সূরা মাউন, ৩০ পারা)।

হাদীসে রিয়ার জঘন্যতা—এক ব্যক্তি রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাস করিল- "ইয়া রাসূলুল্লাহ্, কোন্ কার্যে নাজাত (পরিত্রাণ) পাওয়া যায়?" তিনি বলিলেন- "রিয়া হইতে মুক্ত হইয়া আল্লাহ্‌র ইবাদত করাতেই পরিত্রাণ নিহিত আছে।" তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন যে, কিয়ামত দিবসে এক ব্যক্তিকে বিচার স্থলে উপস্থিত করিয়া জিজ্ঞাসা করা হইবে- "তুমি কোন্ প্রকার ইবাদত করিয়াছ? সেই ব্যক্তি বলিবে- "আমি আল্লাহ্‌র পথে প্রাণ দান করিয়াছি; কাফিরগণ ধর্মযুদ্ধে

আমাকে শহীদ করিয়াছে।" আল্লাহ্ বলিবেন- 'তুমি মিথ্যা বলিতেছ; লোকে তোমাকে বাহাদুর বলিবে এইজন্য তুমি জিহাদ করিয়াছিল। (অতএব হে ফেরেশতাগণ) তাহাকে দোযখে লইয়া যাও।" তৎপর অপর ব্যক্তিকে উপস্থিত করিয়া জিজ্ঞাসা করা হইবে- 'তুমি কি ইবাদত করিয়াছ?" সেই ব্যক্তি বলিবে- "আমি বহু পরিশ্রমে ইল্ম শিক্ষা করিয়াছি এবং কুরআন শরীফ পড়িয়াছি।" আল্লাহ্ বলিবেন- "তুমি মিথ্যা বলিতেছ; লোকে তোমাকে আলিম বলিবে এইজন্যই তুমি ইলম শিক্ষা করিয়াছিলে। তাহাকে দোযখে লইয়া যাও।'

রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "আমার উম্মতের জন্য ছোট শিরক বিষয়ে আমি যেরূপ ভয় করি অন্য কোন বিষয়ে আমি তদ্রূপ ভয় করি না।" সমবেত সাহাবাগণ নিবেদন করিলেন- "ইয়া রাসূলাল্লাহ্, ছোট শিরক কি?" তিনি বলিলেন- "রিয়া। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ বলিবেন-'হে রিয়াকারগণ, যাহাদের উদ্দেশ্যে তোমরা ইবাদত করিয়াছ তাহাদের নিকট গমন কর এবং তাহাদের নিকট হইতেই তোমাদের প্রতিদান চাহিয়া লও।" একদা রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন- "জুবুলহুয্ন হইতে মহাপ্রভু আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা কর।" সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুম নিবেদন করিলেন- "ইয়া রাসূলাল্লাহ্, ইহা কি?" তিনি বলিলেন- "রিয়াকার আলিমদের (শাস্তির) জন্য ইহা দোযখের একটি গর্ত। রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্ বলেন- "যে ব্যক্তি ইবাদতকালে অন্যকে আমার সহিত শরীক করে (আমি তাহার ইবাদত গ্রহণ করি না; বরং) এইরূপ ইবাদতের সমস্তই আমি ঐ শরীককে দিয়া দেই; কেননা অংশীরূপ কলঙ্ক হইতে আমি মুক্ত।" রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "যে ইবাদতে রেণু পরিমাণ রিয়া থাকে আল্লাহ্ তাহা গ্রহণ করেন না।"

একদা হযরত মুআয রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুকে রোদন করিতে দেখিয়া হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু তাঁহাকে রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন- "আমি রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট শুনিয়াছি যে, সামান্য রিয়াও শিরক এবং তিনি বলিয়াছেন, কিয়ামতের দিন রিয়াকারীদিগকে আহ্বান করিয়া বলা হইবে- ' হে রিয়াকার, হে প্রতারক, হে অকর্মণ্য, তোমার ইবাদত ও সৎকর্ম নষ্ট হইয়াছে এবং তোমার প্রতিদান নিস্ফল হইয়া গিয়াছে। যাও, যাহার জন্য কাজ করিয়াছ তাহার নিকট হইতে তোমার প্রতিদান চাহিয়া লও।" হযরত শাদ্দাদ ইব্‌নে আউস রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু একদা রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে রোদন করিতেছেন দেখিয়া রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন- "আমি ভয় করিতেছি যে, আমার উম্মত শিরক করিবে; ইহা নহে যে তাহারা মূর্তি, সূর্য বা চন্দ্রের পূজা করিবে, কিন্তু তাহারা ইবাদতে রিয়াকারী করিবে।" (অর্থাৎ লোককে দেখাইবার উদ্দেশ্যে তাহারা ইবাদত করিবে)। রাসূলে মাক্‌বূল

সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "কিয়ামতের দিন যখন আরশের ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকিবে না তখন এই ছায়াতে ঐ ব্যক্তি স্থান লাভ করিবে যে ডান হস্তে দান করিয়া বাম হস্তকে জানিতে দেয় নাই।"

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন,- "আল্লাহ্ পৃথিবী সৃষ্টি করিলে ইহা কাঁপিতে লাগিল। তৎপর তিনি পর্বতসমূহ সৃষ্টি করিলেন এবং পৃথিবী স্থির হইল। ইহা দেখিয়া ফেরেশতাগণ বলিল যে, আল্লাহ্ পর্বত অপেক্ষা মজবুত আর কোন জিনিস সৃষ্টি করেন নাই। আল্লাহ্ ইহা শুনিয়া লোহা সৃষ্টি করিলেন। তখন ফেরেশতাগণ বলিল- লোহা সর্বাপেক্ষা মজবুত। তৎপর আল্লাহ্ অগ্নি সৃষ্টি করিলেন- অগ্নি লোহা গলাইয়া দিল। পরে আল্লাহ্ পানি সৃষ্টি করিলেন এবং ইহা অগ্নি নির্বাপিত করিয়া দিল। অনন্তর বায়ুকে আদেশ করা হইল। বায়ু পানিকে জমাট বাঁধাইয়া দিল। অতএব (সৃষ্ট বস্তুর শক্তির তারতম্য নির্ধারণে) ফেরেশতাদের মধ্যে মতভেদ হইল। তাহারা আল্লাহ্‌কে জিজ্ঞাসা করিয়া ইহার মীমাংসা করিতে চাহিল। তাহারা নিবেদন করিল- "হে খোদা, তোমার সৃষ্টির মধ্যে কোন্ বস্তু সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী?" আল্লাহ্ বলিলেন- "ডান হস্তে দান করিবারকালে যাহারা বাম হস্ত জানিতে দেয় না, সেই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী করিয়া আমি আর কাহাকেও সৃষ্টি করি নাই।"

হযরত মুআয রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন যে, আকাশ সৃজনের পূর্বে আল্লাহ্ সাতজন ফেরেশতা সৃষ্টি করিলেন এবং সপ্ত আকাশ সৃষ্টি করত এক একজন ফেরেশতাকে এক এক আকাশের পাহারায় নিযুক্ত করিলেন। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত মানুষ যে সমস্ত ইবাদত করে ইহা পৃথিবীতে অবস্থানকারী 'হাফাযা' নামক ফেরেশতা পৃথিবী হইতে প্রথম আকাশে লইয়া গিয়া বান্দার ইবাদতের বহু প্রশংসা করে, কারণ, সেই বান্দা এইরূপ ইবাদত করিয়াছে যে, উহা সূর্যসম উজ্জ্বল হইয়াছে। তখন প্রথম আকাশে পাহারায় রত ফেরেশতা বলে যে, এই ইবাদত ইবাদতকারীর মুখের উপর নিক্ষেপ কর; কেননা আমি গীবতকারীদের পর্যবেক্ষক এবং গীবতকারীর ইবাদত যেন কেহ এই আকাশপথে লইয়া যাইতে না পারে, এই মর্মে আল্লাহ্ আমাকে আদেশ করিয়াছেন। তৎপর যাহারা গীবত করে নাই তাহাদের ইবাদতসমূহ দ্বিতীয় আকাশ পর্যন্ত লইয়া যাওয়া হয়। তথায় নিযুক্ত ফেরেশতা বলে, এই ইবাদত লইয়া ইবাদতকারীর মুখের উপর নিক্ষেপ কর; কারণ দুনিয়া অর্জনের জন্য সে ইহা করিয়াছে এবং ইবাদত করত লোক সমক্ষে গর্ব করিয়াছে। এইরূপ ইবাদত ফেরত দেওয়ার জন্য আমি আদিষ্ট হইয়াছি। ইহার পর ফেরেশতা অন্যান্য লোকের ইবাদত-নামায, রোযা, দান ইত্যাদি লইয়া দ্বিতীয় আকাশ অতিক্রম করিয়া যাইবে এবং এই সকল ইবাদতের জ্যোতি দর্শনে 'হাফাযা' আশ্চর্যান্বিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু তৃতীয় আকাশের দ্বারদেশে পৌঁছিলেই সেই স্থানে নিযুক্ত ফেরেশতা বলে, আমি

অহংকারীদের পর্যবেক্ষকরূপে নিযুক্ত রহিয়াছি। তাহাদের ইবাদত আমি প্রতিরোধ করি। কারণ, তাহারা লোকের সহিত অহংকার করিয়াছে। তৎপর অপরাপর লোকের ইবাদত চতুর্থ আকাশ পর্যন্ত উন্নীত করা হইবে। এই সমস্ত ইবাদত তসবীহ, নামায, হজ্জ ইত্যাদি প্রভাতী নক্ষত্রের ন্যায় উজ্জ্বল থাকিবে। কিন্তু চতুর্থ আকাশের ফেরেশতা বলিবে, আমি খোদ-পছন্দ আত্মাভিমানী লোকের পর্যবেক্ষক। এই ইবাদত খোদ-পছন্দী, আত্মাভিমানশূন্য নহে; সুতরাং উহা এই আকাশ পথে লইয়া যাইতে দিব না, উহা ইবাদতকারীর মুখের উপর নিক্ষেপ কর। তৎপর এই ইবাদতসমূহ ফেলিয়া দিয়া ফেরেশতা অন্যান্য লোকের ইবাদত লইয়া পঞ্চম আকাশ পর্যন্ত উপস্থিত হয়। এই ইবাদতসমূহ নব বধূর ন্যায় সৌষ্ঠবসম্পন্ন ও মনোহর, তথাপি সেই আকাশের ফেরেশতা বলিবে, এই ইবাদতসমূহ ইবাদতকারীর মুখের উপর নিক্ষেপ কর এবং তাহার ঘাড়েই চাপাইয়া দাও; আমি ঈর্ষাকারীদের পর্যবেক্ষকরূপে নিযুক্ত রহিয়াছি; যে ব্যক্তি ইলম ও আমলে তাহার সমান হইতে সে তাহার প্রতি ঈর্ষাভাব পোষণ করিত এবং তাহার বিরুদ্ধে অপ্রিয় কথাবার্তা বলিত। ঈর্ষাপরায়ণ লোকের ইবাদত প্রতিরোধ করিবার জন্য আমাকে আদেশ করা হইয়াছে। অনন্তর 'হাফাযা' এই ইবাদতসমূহ ফেলিয়া অবশিষ্টগুলি সহকারে ষষ্ঠ আকাশে দ্বারদেশে উপনীত হয়। শেষোক্ত ইবাদতসমূহেও নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, উমরা প্রভৃতি আমল রহিয়াছে। কিন্তু সেই আকাশের দ্বারবান ফেরেশতা বলিবে, এই ইবাদত ইবাদতকারীর মুখের উপর নিক্ষেপ কর; কারণ এই ব্যক্তি দুস্থ ও বিপদগ্রস্ত লোকের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে নাই, বরং তাহাদের দুঃখ-দুর্দশা দেখিয়া সে আনন্দিত হইয়াছে, আমি রহমতের ফেরেশতা। নির্দয় লোকের ইবাদত যেন এই স্থান দিয়া অতিক্রম না করে তজ্জন্য আমি আদিষ্ট হইয়াছি।

তৎপর হাফাযা অবশিষ্ট ইবাদতগুলি সপ্তম আকাশে লইয়া যায়। এই ইবাদতসমূহ নামায, রোযা, পারিবারিক ব্যয়, জিহাদ, পরহেযগারী ইত্যাদি কার্যে পরিপূর্ণ এবং সূর্যের ন্যায় দীপ্তিমান থাকে। প্রচণ্ড বজ্রনিনাদের ন্যায় ধ্বনি সহকারে উহার সুখ্যাতি সমস্ত আকাশমণ্ডলে ছড়াইয়া পড়ে; সঙ্গে সঙ্গে তিন সহস্র ফেরেশতা ইবাদতগুলি পাহারা দিয়া চলে এবং কোন ফেরেশতাই কোন প্রকার বাধা প্রদান করিতে পারে না। কিন্তু সপ্তম আকাশের দ্বারদেশে উপনীত হইলে দ্বারবান ফেরেশতা বাধা প্রদান করিয়া বলে, যে সমস্ত ইবাদত একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে করা হয় নাই, শুধু আলিম সমাজে স্বীয় প্রাধান্য স্থাপন এবং দেশ-বিদেশে যশ প্রতিপত্তি বিঘোষণই যাহাদের উদ্দেশ্য ছিল তাহাদের আমল এই আকাশে প্রবেশ করিতে দিবার অনুমতি নাই। যে ইবাদত কেবল আল্লাহ্‌র জন্য না হয়, তাহাই রিয়া; আর রিয়াকারীর ইবাদত আল্লাহ্ গ্রহণ করেন না। সুতরাং রিয়াকারীদের ইবাদত তাহাদের মুখের উপর নিক্ষেপ কর। তৎপর রিয়াকারীদের ইবাদত ফেলিয়া অবশিষ্ট

ইবাদতসমূহ সহকারে ফেরেশতা সপ্তম আকাশ অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে থাকে। এই ইবাদতসমূহ বিশুদ্ধ, সৎস্বভাব, তস্‌বীহ্ ও নানাবিধ ইবাদতের সমষ্টি। আকাশের ফেরেশ্‌তাকুল হাফাযার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্‌র দরবারে গিয়া উপনীত হয় এবং সকলেই এ ইবাদতের প্রশংসা করত সাক্ষ্য প্রদান করিয়া বলে- ইয়া আল্লাহ্! এই ইবাদতগুলি পাক-পবিত্র এবং একমাত্র তোমার উদ্দেশ্যে করা হইয়াছে। আল্লাহ্ বলেন- হে ফেরেশ্‌তাগণ! তোমরা মানুষের বাহ্য ক্রিয়া-কলাপ দর্শন করিয়া থাক মাত্র; কিন্তু আমি তাহাদের অন্তর দেখিয়া থাকি। এই ইবাদত আমার উদ্দেশ্যে করা হয় নাই। ইবাদতকারীর অন্তরে অন্য সংকল্প লুক্কায়িত ছিল। তাহার উপর আমার লা'নত। ফেরেশ্‌তাগণ বলিবে- হে খোদা, তাহার উপর তোমার ও আমাদের সকলের লা'নত। তখন সমস্ত আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে সকলেই তাহার উপর লা'নত করে। রিয়ার জঘন্যতা সম্বন্ধে এবংবিধ আরও বহু হাদীস বর্ণিত আছে।

বুযুর্গগণের উক্তিতে রিয়ার জঘন্যতা—হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু একদা দেখিতে পাইলেন যে, এক ব্যক্তি স্বীয় সাধুতা দেখাইবার উদ্দেশ্যে মস্তক অবনত করিয়া আল্লাহ্‌র যিকিরে লিপ্ত রহিয়াছে। তিনি তাহাকে বলিলেন- "ওহে, তোমার অবনত গ্রীবা সোজা কর। বিনয় অন্তরে থাকে, গ্রীবাতে থাকে না।" হযরত আবূ উমামা রাযিআল্লাহু আন্‌হু দেখিতে পাইলেন এক ব্যক্তি মসজিদে গমন করত সিজদায় প্রণত হইয়া রোদন করিতেছে। তিনি তাহাকে বলিলেন- "তুমি মসজিদে যাহা করিতেছ, তাহা যদি স্বীয় গৃহে করিতে তবে তোমার সমকক্ষ কেহই হইতে পারিত না।" হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন যে, রিয়াকারের তিনটি নিদর্শন আছে। **প্রথম**—নির্জনে একাকী থাকিলে ইবাদত কার্যে শিথিল এবং অলস থাকে; কিন্তু লোক দেখিলে আনন্দিত হইয়া ইবাদতে আগ্রহ ও নিপুণতা দেখায়। **দ্বিতীয়**—লোকমুখে প্রশংসা শুনিলে অধিক ইবাদত করে এবং **তৃতীয়**—নিন্দা শুনিলে ইবাদত নিতান্ত কম করে। এক ব্যক্তি হযরত সা'দ ইব্‌নে মুসাইব রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুকে জিজ্ঞাসা করিল- "যে ব্যক্তি সওয়াব ও লোকের প্রশংসা লাভের আশায় ধন দান করে, তাহার সম্বন্ধে আপনি কি বলেন?" তিনি বলিলেন- "আচ্ছা বলত সেই ব্যক্তি কি আল্লাহ্‌কে শত্রু বানাইতে ইচ্ছা করে?" সেই ব্যক্তি বলিল- "না।" তিনি বলিলেন- "তবে প্রত্যেক কাজই আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে করা উচিত।"

হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু এক ব্যক্তিকে প্রহার করিয়া তাহাকে বলিলেন- "এস ভাই, আমাকে প্রহার করিয়া তোমার প্রতিশোধ গ্রহণ কর।" সেই ব্যক্তি নিবেদন করিল- "হে আমীরুল মুমিনীন, আপনার ও আল্লাহ্‌র সন্তোষ বিধানার্থ আমি ক্ষমা করিয়া দিলাম।" তিনি বলিলেন- "এইরূপ ক্ষমা কোন কাজেরই নহে, হয়ত শুধু আমার জন্য ক্ষমা কর, আমি তোমার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব; আর না হয়,

কাহাকেও শরীক না করিয়া কেবল আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ক্ষমা কর।" সেই ব্যক্তি নিবেদন করিল-" কাহাকেও শরীক না করিয়া একমাত্র আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে আমি ক্ষমা করিয়া দিলাম।" হযরত ফুযাইল (রা) বলেন যে, এমন এক সময় ছিল যখন অপরের ভক্তি ও প্রশংসা লাভের উদ্দেশ্যে লোকে কাজ করিত; কিন্তু এখন লোকে কাজ না করিয়াই ভাবভঙ্গিতে প্রকাশ করে যে কাজ করা হইয়াছে। হযরত কাতাদাহ্ রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলিয়াছেন, লোকে রিয়া করিলে আল্লাহ্ বলেন- "দেখ, আমার বান্দা আমার সহিত কিরূপ ঠাট্টা করিতেছে।"

রিয়া প্রকাশক কর্মসমূহ

রিয়ার পরিচয়—প্রিয় পাঠক, জানিয়া রাখ, নিজের সাধুতা প্রদর্শন ও অপর লোকের ভক্তি আকর্ষণের জন্য নিজকে সাধু ও পরহেযগাররূপে সাজাইবার বাসনাকে রিয়া বলে। যে ধর্মকর্মে সাধুতা ও মহত্ত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় তাহা অপরের সম্মুখে করিয়া দেখাইবার ও প্রকাশ করিবার ইচ্ছা হইলেই বুঝিবে অন্তরে রিয়া রহিয়াছে।

রিয়া প্রকাশের ধারা—প্রকাশের ধারা বিচারে রিয়া পাঁচ ভাগে বিভক্ত।

প্রথম—যাহা দেহের বাহ্য আকার, ক্রিয়া-কলাপ ও হাবভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে; যেমন- চেহারা পাণ্ডুবর্ণ করিয়া রাখিলে লোকে মনে করে যে, সেই ব্যক্তি রাত্রি জাগরণ করত ইবাদতে অতিবাহিত করিয়াছে। নিজকে জীর্ণশীর্ণ দেখাইলে লোকে বুঝে যে, সেই ব্যক্তি কঠোর সাধনা করিয়া থাকে। মুখাবয়বে রোদন চিহ্ন প্রদর্শন করিলে লোকে অনুমান করে, এই ব্যক্তি ধর্ম-চিন্তায় অধীর হইয়া এইরূপ হইয়াছে। চুলে চিরণী ব্যবহার না করিলে লোকে মনে করে যে, এই ব্যক্তি আধ্যাত্মিক উন্নতি বিধানে এত ব্যাপৃত যে, স্বীয় দেহের প্রতি মনোযোগ দেওয়ারও তাহার অবসর নাই। মৃদুস্বরে আস্তে আস্তে কথা বললে লোকে মনে করে, সেই ব্যক্তি নিতান্ত ধর্মভীরু এবং তাহার অন্তর ধর্মভাবে অভিভূত। ওষ্ঠাধর শুষ্ক রাখিলে লোকে মনে করে, এই ব্যক্তি রোযা রাখিয়াছে। এবংবিধ নিদর্শনাবলী দেখিয়া দর্শকগণ তদ্রূপ লোককে সাধু জ্ঞানে ভক্তি করিতে প্রবৃত্ত হয়। অতএব, উহাতে প্রদর্শক পরম আনন্দ অনুভব করে। এই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই হযরত ঈসা আলায়হিস সালাম বলেন- "রোযা রাখিয়া চুলে চিরনী ব্যবহার করাও ওষ্ঠাধরে তৈল লাগানো উচিত, যেমন কেহই তাহাকে রোযাদার বলিয়া চিনিতে না পারে।"

দ্বিতীয়—পোশাক-পরিচ্ছদে প্রকাশিত রিয়া। সাধুদের বৈরাগ্য বসন এবং পুরাতন, মলিন, মোটা ছিন্নবস্ত্র পরিধান করা যাহাতে লোকে পরিধানকারীকে দরবেশ বলিয়া মনে করে। তদ্রূপ নীল পরিচ্ছদ ও নানাবিধ কাপড়ের তালি দেওয়া জায়নামায রাখা যেন লোকে সূফী বলিয়া ভক্তি করে, যদিও সূফীদের গুণাবলীর কিছুই সেই

ব্যক্তির মধ্যে নাই। পাগড়ীর উপর একটি চাদর পরিধান ও মোজার উপর আর একখানা চর্মাবরণ ধারণ করা যেন লোকে বুঝিতে পারে যে, এই ব্যক্তি পবিত্রতা রক্ষার জন্য অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করিয়া থাকে; অথচ পবিত্রতা রক্ষাকল্পে সে মোটেই সর্তক নহে। তদ্রূপ আলিমগণের ন্যায় পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করা, যেন পরিধানকারীকে লোকে আলিম জ্ঞানে মান্য করে যদিও সেই ব্যক্তি আলিম নহে।

পোশাক-পরিচ্ছদে রিয়াকারগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত

প্রথম শ্রেণী—তাহারা জনসাধারণের ভক্তি আকর্ষণের চেষ্টায় ব্যস্ত এবং সর্বদা বৈরাগ্য বসন এবং পুরাতন মলিন ছিন্নবস্ত্র পরিধান করেন।তদ্রূপ, বসন পরিত্যাগপূর্বক তাহাদিগকে বৈধ উৎকৃষ্ট আবাকাবা ইত্যাদি পরিধান করিতে বলিলে ইহা তাহাদের নিকট মৃত্যু অপেক্ষা কঠিন বলিয়া বোধ হয়। কারণ এইরূপ পোশাক পরিধান করিলে লোকে ধারণা করিতে পারে যে, দরবেশ দরবেশী পরিত্যাগ করিয়াছে।

দ্বিতীয় শ্রেণী—এই শ্রেণীর লোকেরা জনসাধারণ, সম্ভ্রান্তমণ্ডলী ও বাদশাহ্‌র ভক্তি আকর্ষণে তৎপর থাকে। পুরাতন ছিন্নবস্ত্র পরিধান করিলে বাদশাহ্ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ হেয় জ্ঞান করিতে পারে; আবার বহুমূল্য বসন পরিধান করিলে জনসাধারণের ভক্তি হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। অতএব, তাহারা বুটাদার সূক্ষ্ম পশমী বসন পরিধান করে সত্য, কিন্তু উহা অতি বহুমূল্য উকপরণে প্রস্তুত থাকে। দরবেশগণের পরিধেয় পোশাকের ন্যায় পাজামা, তহবনদ, জামা ইত্যাদি বস্ত্র তাহারা পরিধান করিলেও উহা ফুলদার, বুটাদার এবং অত্যন্ত মূল্যবান হইয়া থাকে। তাহাদের পরিধানে দরবেশগণের বৈরাগ্য বসন দেখিয়া ও পরহেযগারগণের পরিচ্ছদের ন্যায় বস্ত্র দর্শন করিয়া তাহাদের প্রতি জনসাধারণের ভক্তি অক্ষুণ্ন থাকে; অপরপক্ষে, বহু মূল্য পোশাক-পরিচ্ছদ দেখিয়া বাদশাহ এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণও তাহাদিগকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতে পারে না। এই শ্রেণীর লোকদিগকে সভ্যজনোচিত সাধারণ ও সুলভ বস্ত্র পরিধান করিতে বলিলে তাহারা ইহাকে মৃত্যুসম কঠোর বিপদ মনে করে। এইরূপ সাধারণ ও সুলভ বস্ত্র পরিধান করিলে জনসাধারণ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের সম্মান হইতে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে বলিয়া তাহারা উহা ধারণ করিতে অপমান মনে করে। এই নির্বোধগণ যদিও জানে যে তদ্রূপ পোশাক পরিধান করা অবৈধ নহে এবং বহু ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি উহা পরিধান করিয়া থাকেন তথাপি প্রকাশ্যে উহা পরিধান হইতে তাহারা বিরত থাকে; তবে অপরের অলক্ষিতে স্বীয় গৃহে সেইরূপ পোশাক পরিধান করিয়া থাকে।

তৃতীয়—কথাবার্তায় ও বাগেন্দ্রিয় সঞ্চালনে রিয়া। ইহার উদাহরণ এইরূপ সর্বদা আল্লাহ্‌র যিকিরে ব্যাপৃত আছে, লোকের নিকট ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য কেহ কেহ

সর্বদা ওষ্ঠ সঞ্চালন করিতে থাকে। হয়ত বা তাহারা আল্লাহ্‌র যিকির করিয়া থাকে। আন্তরিক যিকির করিলে কি যিকির হইত না? কিন্তু তাহারা আল্লাহ্‌র স্তুতিগায়করূপে পরিচিত হইবার নিমিত্ত ওষ্ঠ সঞ্চালন করিয়া থাকে। তাহাদের আশঙ্কা হয় যে, ওষ্ঠ সঞ্চালন না করিলে লোকে তাহাদিগকে ভক্তি করিবেনা। কেহ কেহ লোকসমক্ষে পাপের প্রতি নিতান্ত ঘৃণা প্রকাশ করে এবং পাপ হইতে অতি যত্নে বিরত থাকে; কিন্তু নির্জনে তাহাদের এই অবস্থা থাকে না। কেহ কেহ লোকের নিকট কামিল দরবেশ বলিয়া সুখ্যাতি অর্জনের উদ্দেশ্যে সূফীদের দরবেশী কথা মুখস্ত করিয়া লয় এবং সুযোগ পাইলেই ইহা আওড়াইতে থাকে যেন লোকে মনে করে, এই ব্যক্তি আল্লাহ্-প্রেমে অভিভূত হইয়া রহিয়াছে। কেহ মধ্যে মধ্যে 'হায়' 'আহা' শব্দ উচ্চারণে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বা নিজেকে নিতান্ত দুঃখিত বিমর্ষ দেখায় যাহাতে লোকে মনে করিতে পারে যে, এই ব্যক্তি ইসলামের অবনতি দেখিয়া মর্মাহত হইয়াছে। কেহ আবার কতিপয় হাদীসের উক্তি ও বিবিধ কাহিনী মুখস্থ করিয়া সময়ে-অসময়ে বর্ণনা করিতে থাকে; উহা শুনিয়া যেন লোকে তাহাকে বড় আলিম বলিয়া সম্মান করে এবং মনে করে যে, সে বহু অভিজ্ঞ পীরের দর্শন লাভ ও বহু দেশ পর্যটন করিয়া যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করিয়াছে।

চতুর্থ—ইবাদতে রিয়া। ইহার দৃষ্টান্ত এইরূপ-কেহ কেহ লোকসমক্ষে খুব সুন্দরভাবে নামায পড়ে; যথোচিতভাবে মস্তক অবনত করিয়া দীর্ঘ রুকূ ও সিজদা করে এবং এদিক সেদিকও তাকায় না; আবার অপরকে দেখাইয়া দান-খয়রাত করে। এবং বিধ আরও বহু বিষয় আছে যাহাতে রিয়া হইয়া থাকে। যেমন লোকের সম্মুখে খুব মৃদু গতিতে মস্তক অবনত করিয়া চলা; একাকী চলিবারকালে এদিকে ওদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দ্রুতগতিতে চলা; কিন্তু দূর হইতে কাহাকেও আসিতে দেখিলে আবার আস্তে আস্তে চলিতে আরম্ভ করা ইত্যাদি।

পঞ্চম—আত্মশ্লাঘা প্রকাশে রিয়া। কেহ কেহ বাহাদুরী প্রকাশ করিয়া বলে যে, আমার বহু মুরীদ আছে, অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, আমীর-ওমরা আমাকে সালাম দিতে আসেন এবং আমার আশীর্বাদ লাভ করিয়া গৌরব অনুভব করেন; আলিমগণ আমাকে ভক্তি করিয়া থাকেন এবং তাঁহারা আমাকে ওলী বলিয়া বিশ্বাস করেন। কাহারও সহিত তর্ক-বিতর্ককালে এই প্রকৃতির লোকেই বলিয়া থাকে- তুমি অতি নগণ্য; তোমাকে কে চিনে? তোমার পীরই বা কে? তোমার মুরীদই বা কত? আমি বহু অভিজ্ঞ পীরের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছি এবং বহু বৎসর অমুক পীরের সাহচর্যে অতিবাহিত করিয়াছি। তুমি কাহাকে দেখিয়াছ? এই শ্রেণীর রিয়াকারগণ তদ্রূপ নানাবিদ কথা বলিয়া নিজদিগকে দুঃখ-কষ্টে নিপাতিত কর।

পানাহারে রিয়া অতি সহজে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এক খৃষ্টান সন্ন্যাসী এত প্রশংসা প্রিয় ছিল যে, সাধু বলিয়া অপরের প্রশংসা লাভের উদ্দেশ্যে স্বীয় আহার হ্রাস

করিতে করিতে অবশেষে তাহার দৈনিক আহারের পরিমাণ মাত্র একটি চানাবুটে পরিণত করে। দরবেশী প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে ইবাদতে এবং বিধ সমস্ত কাজই হারাম, কেননা, একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যই দরবেশী অর্জন করা আবশ্যক।

স্থান বিশেষে রিয়া নির্দোষ—ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত নহে এমন কার্য দ্বারা দরবেশী প্রকাশ না করিয়া ও আবশ্যকতার সীমা অতিক্রম না করিয়া লোকের নিকট সম্মান ও প্রতিপত্তি কামনা করা হারাম নহে; যেমন উত্তম পোশাক পরিধান করিয়া বহির্গত হওয়া। উত্তম পোশাক পরিধান করত বহিগত হওয়াতে কোন দোষ নাই বরং ইহা সুন্নত। কারণ এইরূপ পোশাক পরিধানে দরবেশী প্রকাশ পায় না, বরং সভ্যতাই প্রকাশ পাইয়া থাকে। তদ্রুপ সাহিত্য, ব্যাকরণ, গণিত, চিকিৎসা-শাস্ত্র কিংবা এমন কোন বিষয় যাহার সহিত ধর্মবিদ্যার কোন সম্বন্ধ নাই বা যাহা ইবাদতের অন্তর্গত নহে তেমন বিষয়ে স্বীয় প্রাধান্য প্রকাশেও কোন দোষ নাই। ইতঃপূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে যে, আবশ্যকতা সীমা অতিক্রম না করিয়া ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত নহে এমন কার্য দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব কামনা করা অবৈধ নহে।

একদা সাহাবাগণ (রা) সমবেত ছিলেন, এমতাবস্থায়, রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম গৃহ হইতে বহির্গত হইবার কালে একটি জলপত্রের পার্শ্বে দন্ডায়মান হইয়া স্বীয় কেশমুবারক ও পাগড়ী সুসজ্জিত করিয়া লইলেন। ইহা দেখিয়া হযরত আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা নিবেদন করিলেন- "ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আপনিও এইরূপ করেন?" তিনি বলিলেন- "হাঁ, স্বীয় ভাই-বন্ধুদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার কালে নিজের অঙ্গসৌষ্ঠব ও পরিচ্ছদ পরিপাটি করা আল্লাহ্ পছন্দ করিয়া থাকেন।" রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা পাওয়া যায় তাহাই মূল ধর্ম। তাঁহাকে নিখিল বিশ্বের শিক্ষকরূপে প্রেরণ করা হইয়াছে। অতএব তাঁহাকে এইরূপে চলিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে যেন লোকের হৃদয়-দৃষ্টি তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং লোকে তাঁহাকে ভক্তি ও অনুসরণ করে। কিন্তু কেহ যদি শুধু অঙ্গ-সৌষ্ঠবের উদ্দেশ্যে পরিচ্ছদ পরিপাটি করে তবে ইহা জায়েয হইবে; বরং ইহা সুন্নত। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার মধ্যে বহু উপকার নিহিত রহিয়াছে। সমাজে প্রচলিত ভদ্রতার প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া অপরিচ্ছন্ন ও অশোভন পোশাক-পরিচ্ছদ ধারণ করিলে তৎপ্রতি লোকের ঘৃণার উদ্রেক হইতে পারে এবং অগোচরে তাহারা তাহার নিন্দা করিতে পারে। এমতাবস্থায়, নিজেই এইরূপ ঘৃণা এবং পরনিন্দার একমাত্র কারণ হইয়া থাকে।

ইবাদতে রিয়া হারাম হওয়ার কারণ—দুইট কারণে ইবাদতে রিয়া হারাম। প্রথম কারণ-প্রতারণা। রিয়াকার লোকের নিকট প্রকাশ করে যে, একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যই সে ইবাদত করিয়া থাকে; কিন্তু বাস্তবপক্ষে ইহা না করিয়া সে লোকের ভক্তি আকর্ষণের জন্য ইবাদত করত তাহাদিগকে প্রতারিত করে। লোকে যদি বুঝিতে

পারিত যে, ইবাদতের ভান করিয়া প্রতারণাপূর্বক তাহাদের নিকট ভক্তিভাজন হওয়ার চেষ্টা চলিতেছে তবে তাহারা এমন ব্যক্তিকে প্রতারক বলিয়া ঘৃণা করিত। দ্বিতীয় কারণ– আল্লাহ্‌র সহিত ঠাট্টা। নামায, রোযা ইত্যাদি ইবাদত শুধু আল্লাহ্‌র জন্য সম্পাদন করা আবশ্যক; উহাতে মহাপ্রভু আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন উদ্দেশ্যই থাকিতে পারে না। কিন্তু উহাতে দুর্বল অপদার্থ মানবের মনস্তুষ্টির উদ্দেশ্য থাকিলে তদ্দ্বারা পরম পরাক্রান্ত আল্লাহ্‌র সহিত ঠাট্টা করা হইয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ, মনে কর, কোন ব্যক্তি বাদশাহর দরবারে দণ্ডায়মান হইয়া প্রকাশ করিতেছে যে, সে বাদশাহ্‌র খেদমতে নিযুক্ত আছে; কিন্তু দরবারের কোন দাস বা দাসীর সাক্ষাৎ লাভই তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য, খেদমত উদ্দেশ্য নহে। ইহাতে দাস বা দাসীর দর্শন লাভকে বাদশাহ্‌র খেদমতের উপর প্রাধান্য দেওয়া হইল। সুতরাং এমন কার্য বাদশাহ্‌র সহিত ঠাট্টা ব্যতীত আর কিছুই নহে। নামাযে দণ্ডায়মান হইয়া রুকূ-সিজদা আল্লাহ্‌র জন্য না করিয়া অপরের ভক্তি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে করাও ঠিক তদ্রূপ। এইরূপ ইবাদতে প্রকাশ্য শিরক হইয়া থাকে। কিন্তু রুকূ-সিজদা যদি আল্লাহ্‌র জন্য করা হয় এবং অন্তরে মানুষের ভক্তি আকর্ষণের উদ্দেশ্যও থাকে তবে ইহাকে গুপ্ত শিরক বলা যায়, প্রকাশ্য শিরক বলা চলে না।

রিয়ার শ্রেণীবিভাগ

প্রিয় পাঠক, জানিয়া রাখ, রিয়া বহু শ্রেণীতে বিভক্ত। তন্মধ্যে কোনটি নিতান্ত মারাত্মক। ইহাদের মধ্যে পরস্পর যে পার্থক্য রহিয়াছে তাহা নিম্নলিখিত তিনটি বিষয়ে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

(১) অপরের ভক্তি ও পুণ্যের আশায় তারতম্যানুসারে রিয়ার শ্রেণীভেদ। **প্রথম**—যে ইবাদতে পুণ্য লাভের আশা মোটেই থাকে না, শুধু অপরের ভক্তি পাইবার উদ্দেশ্যেই ইবাদত করা হয়, এইরূপ রিয়া নিতান্ত জঘন্য এবং তজ্জন্য পরকালে অতি কঠোর শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। যে ব্যক্তি লোকসমক্ষে রোযা রাখে এবং নামায পড়ে, কিন্তু নির্জনে একাকী কিছুই করে না সে-ই এই শ্রেণীর অন্তর্গত। **দ্বিতীয়**—ইবাদতে পুণ্য লাভের আশা থাকে সত্য, কিন্তু ইহা নিতান্ত দুর্বল। ইহার নিদর্শন এই যে, তদ্রূপ লোক নির্জনে একাকী অবস্থানকালে নামায, রোযা আদৌ করে না। এই প্রকার রিয়া প্রায় প্রথম শ্রেণীর মতই জঘণ্য। পুণ্য লাভের এইরূপ ক্ষীণ আশা তাহাকে আল্লাহ্‌র ক্রোধ হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না। **তৃতীয়**—পুণ্য লাভের আশা যদি প্রবল থাকে এবং একাকী থাকিবার কালেও সে নামায-রোযা করে, তবে লোকসমক্ষে উৎসাহ বৃদ্ধি পায় এবং কাজও অনায়াসে সম্পন্ন হইয়া থাকে, এইরূপ স্থলে আমাদের আশা যে, তাহার ইবাদত সম্পূর্ণরূপে নষ্ট বা পুণ্য একেবারে বিনাশ হইবে না। কিন্তু

রিয়া যে পরিমাণে বলবান থাকিবে, সেই পরিমাণে অবশ্যই শাস্তি হইবে বা পুণ্য হ্রাস পাইবে। **চতুর্থ**—অপরের ভক্তি ও পুণ্য লাভের আশা। এই উভয়টিই সমান সমান হইলে এবং কোনটিই অপরটি অপেক্ষা প্রবল না থাকিলে পুণ্য ভাগাভাগি হইয়া পড়িবে। প্রকাশ্য হাদীস হইতে ইহাই বুঝা যায় যে, মানুষ তদ্রূপ স্থলে রিয়ার পাপ হইতে নিরাপদে অব্যাহতি পাইবে না, বরং তাহাকে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

(২) কার্যের প্রকৃতি ভেদে রিয়ার শ্রেণীভেদ—ইবাদত কার্যের প্রকৃতি ভেদে রিয়া তিন শ্রেণীতে বিভক্ত।

প্রথম—মূল ঈমানের রিয়া করা অর্থাৎ বাস্তবিকপক্ষে অন্তরে ঈমানদার না হইয়া শুধু লোককে দেখাইবার উদ্দেশ্যে নিজকে ঈমানদার বলিয়া পরিচয় দেওয়া, ঈমানবিহীন মুনাফিকগণ এইরূপ করিয়া থাকে। পরকালে তাহাদের প্রতি শাস্তি কাফিরদের অপেক্ষা অধিক ভয়ংকর ও কঠোর হইবে। ইহার কারণ এই যে, তাহারা আন্তরিকভাবে কাফির; কিন্তু প্রতারণাপূর্বক লোকদের নিকট ঈমানদার বলিয়া প্রকাশ করে। ইসলামের প্রাথমিককালে এই প্রকার মুনাফিকের সংখ্যা অধিক ছিল। এখন তাহাদের সংখ্যা অতি বিরল। তবে বর্তমানে ইবাদতী সম্প্রদায় ও ধর্মদ্রোহী নাস্তিকগণ তাহাদের স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। তাহারা শরীয়তের আইন ও পরকালে বিশ্বাস করে না এবং প্রকাশ্যে উহার বিরুদ্ধাচরণ করে। তাহারাও উল্লিখিত বেঈমান মুনাফিকদের ন্যায় চিরকাল কঠিন দোযখ-যন্ত্রণা ভোগ করিবে।

দ্বিতীয়—প্রকৃত ইবাদত কার্যে রিয়া। লোককে দেখাইবার উদ্দেশ্যে নামায পড়া বা রোযা রাখা; কিন্তু নির্জনে একাকী থাকিলে কিছুই না করা। তেমন লোক বিনা-ওযুতেও নামায পড়িয়া থাকে। এইরূপ রিয়াও অতি ভয়ংকর যদিও বেঈমান মুনাফিকদের রিয়ার ন্যায় ইহা তত মারাত্মক নহে। মোটের উপর কথা এই, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তোষ অপেক্ষা অপরের ভক্তি অধিক ভালবাসে, কাফির না হইলেও তাহার ঈমান নিতান্ত দুর্বল। সময় থাকিতে তওবা না করিলে মৃত্যুকালে এইরূপ ব্যক্তির বেঈমান হইয়া মরিবার আশঙ্কা আছে।

তৃতীয়—সুন্নত ইবাদতে রিয়া। কেহ কেহ ঈমান ও ফরয কার্যে রিয়া না করিয়া থাকিলেও সুন্নত কার্যে রিয়া করিয়া থাকে; যেমন, লোককে দেখাইবার উদ্দেশ্যে তাহাজ্জুদ নামায পড়া, সদ্‌কা-খয়রাত করা, জমাআতে নামায পড়িতে যাওয়া, আরফা ও আশুরার দিন এবং প্রতি বৃহস্পতিবারে রোযা রাখা। অপরের নিন্দা হইতে অব্যাহতি বা প্রশংসা লাভের উদ্দেশ্যে এইরূপ কার্য করিলে রিয়া হইয়া থাকে। তেমন রিয়াকারকে রিয়া হইতে বিরত থাকার নির্দেশ দিলে সে হয়ত বলিবে–"আমার পক্ষে এই সকল কার্য করা না করা সমান এবং উহা সম্পাদন করা আমার জন্য ওয়াজিব নহে। অতএব, উহাতে সওয়াব না হউক, কিন্তু কোন শাস্তি না হইলেও চলে।" জানিয়া রাখ, সুন্নত কার্যে রিয়া করিলে যে শাস্তি হইবে না তাহা ঠিক নহে। কারণ,

সর্বপ্রকার ইবাদতই একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য নির্ধারিত। উহাতে আল্লাহ্ ব্যতীত আর কাহারও কোন অংশ নাই। সুতরাং যে কার্য একমাত্র আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে করা আবশ্যক তাহা অপরের প্রশংসা লাভ বা নিন্দার পথ রুদ্ধ করার জন্য করিলে সৃষ্ট জীবকে সৃষ্টিকর্তার উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হয় এবং ইহাতে আল্লাহ্‌র প্রতি ঠাট্টা করা হইয়া থাকে। তজ্জন্যই এইরূপ রিয়ার কারণে শাস্তিরও বিধান রহিয়াছে। অবশ্য সেই শাস্তি ফরয ইবাদতে রিয়াজনিত শাস্তির তুল্য কঠোর হইবে না। তবে সুন্নত ইবাদতে রিয়া প্রায় ফরয কার্যে রিয়ার ন্যায়ই জঘণ্য। সুন্নত ইবাদতে রিয়ার দৃষ্টান্ত এই– লোকসমক্ষে উত্তমরূপে রুকূ-সিজদা করা এবং এদিক সেদিক দৃষ্টিপাত না করা; লম্বা কিরাত না পড়া, জমাআত ব্যতীত নামায পড়াকে অসঙ্গত মনে করত জমাআতের অন্বেষণ করা এবং প্রথম সারিতে স্থান পাইবার চেষ্টা করা, উত্তম ধন হইতে যাকাত দেওয়া এবং রোযা রাখিয়া নির্জনতা অবলম্বনপূর্বক নীরব থাকা, ইত্যাদি।

(৩) উদ্দেশ্যের তারতম্যানুসারে রিয়ার শ্রেণীবিভাগ—রিয়া কার্যে রিয়াকারের কোন না কোন উদ্দেশ্য অবশ্যই নিহিত থাকে। তাহার উদ্দেশ্যে গুরুত্ব ও লঘুত্ব বিচারে রিয়া তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত।

প্রথম—রিয়া দ্বারা প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জন করত পাপ ও কুকর্মের সুযোগ-সুবিধা লাভ করা। যেমন নিজেকে বিশ্বস্ত, আমানতদার, পরহেযগার ও সন্দেহজনক ধন বর্জনকারীরূপে পরিচয় প্রদান করা, যেন লোকে তাহাকে ওয়াক্‌ফ ও য়াতীম সন্তান-সন্ততির সম্পত্তির মুতাওল্লী, ওসীয়ত করা বিষয়ের সম্পাদক নিযুক্ত করে এবং নানাবিধ ধন-দৌলত তাহার নিকট গচ্ছিদ রাখে; আর সে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী স্বেচ্ছায় ধন-সম্পত্তি আত্মসাৎ করিতে পারে। আবার কেহ এই দুরভিসন্ধি অন্তরে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া যাকাত ও দান-খয়রাতের ধন উপযুক্ত ব্যক্তিগণকে বিতরণ করিবার ভার গ্রহণ করে, গরীব হজ্জ যাত্রীগণের পথ খরচ প্রেরণের ভার লয়, সুফীগণের খানকাহ্‌র ব্যয় নির্বাহ এবং পুল, পান্থশালা নির্মাণ ইত্যাদির অর্থ অপরের নিকট হইতে হস্তগত করত লোকের অজ্ঞাতসারে সে নিজেই উহা উপভোগ করে। কেহ হয়ত নিজের সাধুতার পরিচয় দেওয়ার জন্য ধর্ম-সভা আহবান করে; কিন্তু ইহার উদ্দেশ্য থাকে কোন মহিলা আগমন করিলে তাহার দর্শন লাভ ও তাহাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করা এবং সুযোগ পাইলে তাহার সহিত অপকর্মে প্রবৃত্ত হওয়া। কেহ হয়ত আবার কোন মহিলা বা দাসীর দর্শন লাভের কুমতলব লইয়া ধর্ম সভায় গমন করে। তদ্রূপ নানাবিধ অসৎ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া রিয়াকারগণ ধর্মের ভান করিয়া থাকে। এবং আল্লাহ্‌র ইবাদতকে তাঁহারই নিষিদ্ধ পাপাচারের অবলম্বন-স্বরূপ গ্রহণ করে। কোন সময় এইরূপও ঘটিয়া থাকে যে, মনে কর, কাহারও বিরুদ্ধে অপরের ধন অপহরণের দুর্নাম রটিয়াছে বা কোন কামিনীর সহিত ব্যভিচারের অপবাদ হইয়াছে, তেমন ব্যক্তি স্বীয় সাধুতা প্রদর্শন করত দুর্নাম অপসারণের উদ্দেশ্যে প্রকাশ্যে ধন বিতরণ করিয়া

থাকে, যেন লোকে বলে–যে-ব্যক্তি মুক্ত হস্তে স্বীয় ধন দান করে, সে কি কখনও অন্যের ধন অপহরণ করিতে পারে? অথবা এইরূপ সাধু ব্যক্তি কিরূপে পরস্ত্রীর প্রতি কু-ভাবে দৃষ্টিপাত করিতে পারে? এই শ্রেণীর রিয়া অতি জঘন্য।

দ্বিতীয়—কোন নির্দোষ বস্তু হস্তগত করিবার উদ্দেশ্যে রিয়া। ইহার দৃষ্টান্ত এইরূপ– মনে কর, কোন বক্তা স্বীয় সাধুতা প্রকাশ করত লোকের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ বা কোন কামিনীকে বিবাহ করিবার উদ্দেশ্যে সুললিত বচনে সারগর্ভ বক্তৃতা করিল। এরূপ ব্যক্তিও পরকালের শাস্তি হইতে পরিত্রাণ পাইবে না। কিন্তু ইহা প্রথম শ্রেণীর রিয়ার শাস্তির ন্যায় তত কঠিন হইবে না। এই প্রকার ব্যক্তি মহাপ্রভু আল্লাহ্‌র ইবাদতকে পার্থিব ক্ষণস্থায়ী পদার্থ লাভের অবলম্বনস্বরূপ গ্রহণ করিয়া থাকে; অথচ ইবাদত কেবল আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভ ও পারলৌকিক সৌভাগ্য অর্জনের উদ্দেশ্যেই হওয়া আবশ্যক। অতএব যে ব্যক্তি ইবাদতকে দুনিয়া লাভের অবলম্বনস্বরূপ গ্রহণ করিল সে যেন পরমপরাক্রান্ত আল্লাহ্‌র সহিত প্রতারণা করিল!

তৃতীয়—এই শ্রেণীর রিয়াতে কোন পদার্থ লাভের আশা থাকে না বটে, কিন্তু সাধু দরবেশগণের ন্যায় সম্মান পাইবার উদ্দেশ্যে লোকে এইরূপ রিয়ার বশীভূত হইয়া থাকে, তেমন ব্যক্তি লোকসমক্ষে চলিবারকালে মস্তক অবনত করিয়া মন্থর গতিতে দরবেশী পদক্ষেপে চলিতে থাকে, যেন লোকে তাহাকে আল্লাহ্ হইতে অন্যমনস্ক মনে না করে এবং এই বলিয়া তাহাকে সম্মান করে যে, পথ চলিবার কালেও তিনি ধর্ম-কর্মে ব্যাপৃত থাকেন। হাসি আসিলে কেহ কেহ আটকাইয়া রাখে, যাহাতে অপরে তাহাকে কৌতুক-প্রিয়, চপল বলিয়া অবজ্ঞা না করে অথবা তাহাকে লোকে উপহাসাস্পদ মনে করিবে বলিয়া সে কৌতুক হইতে বিরত থাকে। আবার কেহ কেহ নিজকে গভীর ধর্মভাবে মগ্ন বলিয়া প্রকাশের উদ্দেশ্যে সময়ে অসময়ে 'হায়!' 'আহা!' ইত্যাদি শব্দ উচ্চারণ করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করে এবং 'ইস্তিগফার' পড়িতে থাকে ও বলে– "সুবহানাল্লাহ্! মানুষ কত গাফ্‌লতে (খোদা বিস্মৃতিতে) নিমগ্ন রহিয়াছে? আমরা এত সমস্ত সংকটের সম্মুখীন হইয়াও কিরূপে এমন উদাসীন থাকিতে পারি?" নির্জনে একাকী থাকিলে সেই ব্যক্তি হয়ত কখনও তদ্‌রূপ ইস্তিগফার ও অনুতাপ করে না। অন্তর্যামী আল্লাহ্ তাহাদের মনের কথা ভালরূপেই অবগত আছেন।

আবার এমন লোকও আছে, যাহার সম্মুখে একে অপরের গীবত করিলে সে বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠে– "গীবত করা অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য মানুষের রহিয়াছে।" গীবতের প্রতি তাহার আন্তরিক ঘৃণা প্রকাশ করাই তদ্‌রূপ উক্তির একমাত্র উদ্দেশ্য। আবার কেহ কেহ অপরকে তারাবী ও তাহাজ্জুদের নামাযে রত এবং সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখিতে দেখিয়া লোকে তাহাদিগকে ধর্ম-কর্মে শিথিল মনে করিবে, এই আশংকায় তদ্‌রূপ নামায-রোযায় প্রবৃত্ত হয়। আবার কতক

লোক আরফা ও আশুরার দিনে রোযা রাখে না বটে, অথচ লোকের নিকট রোযাদাররূপে পরিচিত হওয়ার উদ্দেশ্যে পানাহার হইতে নিবৃত্ত থাকে। আবার এমন লোকও আছে, যে বাস্তবিকপক্ষে রোযা রাখে নাই, কিন্তু তাহাকে খাওয়ার জন্য অনুরোধ করিলে সে বলিয়া থাকে– "আমার ওযর আছে।" (অর্থাৎ আমি রোযা রাখিয়াছি)। এইরূপ উক্তিতে সেই ব্যক্তির অন্তর দুইটি দোষে কলুষিত হইয়া থাকে। যথা– (ক) কপটতা; কেননা সে রোযা রাখে নাই, অথচ প্রকাশ করে যে, সে রোযা রাখিয়াছে। (খ) রিয়া। সেই ব্যক্তি বলে– "আমি বলি না যে, আমি রোযা রাখিয়াছি; বরং আমি আমার ওযরের কথা জানাইয়াছি।" এইরূপ উক্তি দ্বারা সেই ব্যক্তি স্বীয় সংকল্পের বিশুদ্ধতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য ব্যগ্র, অথচ সে নিজ সংকল্পে বিশুদ্ধ নহে।

আর কেহ কেহ লোকের সম্মুখে পানি পান করিয়া বলে– "গতকল্য অসুস্থ ছিলাম বলিয়া অদ্য রোযা রাখিতে পারি নাই।" অথবা "অমুক ব্যক্তি আমাকে রোযা রাখিতে দেয় নাই।" আবার কেহ কেহ রিয়া প্রকাশিত হওয়ার আশংকায় পানি পানের সাথে সাথে তদ্রূপ উক্তি করে না বটে, কিন্তু কিছুক্ষণ পর অন্য প্রসঙ্গে বলে– "আমার জননীর হৃদয় নিতান্ত কোমল। পুত্রের উপবাস তাহার জন্য প্রাণান্তকর হইবে।" অথবা কেহ বলে– "আমার উপবাস-কষ্টে মাতার প্রাণাবসান ঘটিতে পারে, এই আশংকায় আমি রোযা রাখি নাই।" আবার কেহ কেহ এইরূপও বলিয়া থাকে– "দিবসে রোযা রাখিলে রাত্রিতে শীঘ্র নিদ্রা আসে। অতএব, ইবাদতের জন্য রাত্রি জাগরণ করা যায় না।"

রিয়ার অপবিত্রতায় অন্তর কলুষিত হইলে সেইরূপ নানাবিধ উক্তিই মানুষের রসনা হইতে নিঃসৃত হইয়া থাকে। কিন্তু সেই ব্যক্তি বুঝিতে পারে না যে, ইহাতে তাহার পরহেযগারীর মূল উৎপাটিত হয় এবং তাহার ইবাদতও বিনষ্ট হইয়া যায়। যে সকল রিয়ার কথা উপরে বর্ণিত হইল উহা অবগত হওয়া নিতান্ত সহজ। কিন্তু এইরূপ কতকগুলি রিয়া আছে যাহা পিপীলিকার পদধ্বনি অপেক্ষা অধিক প্রচ্ছন্ন। বিচক্ষণ জ্ঞানীগণের পক্ষেও তদ্রূপ রিয়া চিনিয়া লওয়া দুষ্কর হইয়া উঠে। অল্প বুদ্ধিমান ও মূর্খ আবিদগণ কিরূপে উহা বুঝিতে পারিবে?

প্রকাশের তারতম্যানুসারে রিয়ার শ্রেণীবিভাগ

পিপীলিকার পদসঞ্চার অপেক্ষা গুপ্ত ও দুর্বোধ্য রিয়া। **সুস্পষ্ট রিয়া**– প্রিয় পাঠক, অবশ্য বুঝিতে পারিয়াছ যে, কতকগুলি রিয়া অতি সুস্পষ্ট; যেমন– কোন ব্যক্তি লোকসমক্ষে উৎসাহের সহিত তাহাজ্জুদের নামায পড়ে, কিন্তু একাকী নির্জনে অবস্থানকালে পড়ে না। **অস্পষ্ট রিয়া**– ইহা পিপীলিকার পদসঞ্চারের মত এত দুর্বোধ্য না হইলেও পূর্বোক্ত রিয়ার ন্যায় তত সুস্পষ্ট নহে। যেমন মনে কর, কেহ একাকী

নির্জনে অবস্থানকালেও তাহাজ্জুদ নামায পড়িতে অভ্যস্ত বটে, কিন্তু লোকের সম্মুখে নামায পড়িলে তাহার হৃদয়ে অধিক আনন্দ অনুভব হইয়া থাকে এবং অতি সহজে কাজটি সুসম্পন্ন হয়। এই শ্রেণীর রিয়াও বেশ বুঝা যায়। **গুপ্ত রিয়া**– আবার এইরূপ লোকও আছে, অপরের সম্মুখে তাহাজ্জুদের নামায পড়িতে যাহার অধিক আনন্দ অনুভব হয় না বা নামায সম্পন্ন করাও তাহার নিকট অতি সহজসাধ্য বলিয়া মনে হয় না; আর অভ্যাসবশতঃ প্রত্যহই সে নামায পড়িয়া থাকে এবং রিয়ার কোন প্রকাশ্য নিদর্শনই ইহাতে পাওয়া যায় না। কিন্তু লৌহের মধ্যে যেমন অগ্নি গুপ্তভাবে থাকে তাহার অন্তরেও তদ্রূপ রিয়া গুপ্তভাবে থাকিতে পারে। ইবাদত-কার্য ও সদগুণ প্রকাশ পাইলে যদি মনে আনন্দ ও প্রফুল্লতা জন্মে তবেই এইরূপ গুপ্ত রিয়ার পরিচয় পাওয়া যায়। এইরূপ আনন্দ সঞ্চারের বিরুদ্ধাচরণ ও তৎপ্রতি অবজ্ঞার দৃষ্টিতে অবলোকন না করিলে এই গুপ্ত রিয়া প্রবল হইয়া উঠিতে পারে। লোকচক্ষুর অন্তরালে সম্পন্ন ইবাদত প্রকাশিত হউক, এই আশা তখন ইবাদতকারীর হৃদয়ে গুপ্তভাবে থাকে। স্বীয় ইবাদত পরিষ্কাররূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। আর ইশারা-ইঙ্গিতে ইহা প্রকাশ না পাইলেও আকৃতিতে এমন ভাব অবলম্বন করা হয়, যাহাতে লোকে তাহার ইবাদত সম্বন্ধে জ্ঞাত হইতে পারে, যেমন লোকের সম্মুখে বিমর্ষ হৃদয়ে মস্তক অবনত করিয়া বসিয়া থাকে যেন অপরে বুঝিতে পারে যে, সে রাত্রি জাগরণ করত ইবাদত করিয়াছে।

পিপীলিকার পদসঞ্চার অপেক্ষা গুপ্ত ও দুর্বোধ্য রিয়া—উপরিউক্ত রিয়া অপেক্ষাও নিতান্ত গুপ্ত রিয়া আছে; ইহা পিপীলিকার পদসঞ্চার অপেক্ষাও অধিক গুপ্ত এবং দুর্বোধ্য। গোপনীয় ইবাদত কার্য প্রকাশিত হইলে মনে আনন্দের সঞ্চার না হইলে বা লোকসমক্ষে তদ্রূপ ইবাদত করিতে হৃদয় অধিকতর উৎফুল্ল হইয়া না উঠিলেও অন্তরে রিয়া থাকিতে পারে। ইহার নিদর্শন এই– তদ্রূপ রিয়াবিশিষ্ট লোকের নিকট কেহ আসিয়া অগ্রে সালাম না করিলে সে বিস্মিত হয়। তাহাকে সম্মান প্রদর্শন না করিলে, আনন্দের সহিত তাহার কার্য সম্পন্ন করিয়া না দিলে, ক্রয়-বিক্রয়ের সময় তাহাকে অনুগ্রহ না দেখাইলে বা উত্তম স্থানে তাহাকে বসিতে না দিলে সে মনে মনে আশ্চর্যান্বিত হইয়া থাকে। আর সেই ব্যক্তি তখন মনে মনে বলিতে থাকে– "রে মূর্খ, তুই গুপ্তভাবে ইবাদত না করিলে লোকে তোর সহিত এইরূপ ব্যবহার করিত না।" এইরূপ মনোভাবে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি বিধান তাহার ইবাদতের উদ্দেশ্য নহে; বরং ইহা দ্বারা লোকের ভক্তি-শ্রদ্ধা আকর্ষণের চেষ্টা রহিয়াছে। মোটের উপর কথা এই যে, ইবাদত-কার্য করিয়া 'করিলাম' বলিয়া মনে যে ভাব জন্মে, ইহা হৃদয় হইতে একেবারে মুছিয়া ফেলিয়া 'কিছুই করিতে পারিলাম না' এইভাব অন্তরে জাগরূক রাখিতে না পারিলে অন্তর কখনও গুপ্ত রিয়া হইতে মুক্ত হইতে পারে না।

মনে কর, এক ব্যক্তি এক লক্ষ টাকা মূল্যের দ্রব্য লাভের আশায় কাহাকেও এক হাজার টাকা প্রদান করিল। ইহাতে অন্য কাহারও কোন উপকার হয় নাই; সুতরাং সে তজ্জন্য অপরের নিকট হইতে সম্মানের প্রত্যাশা করিতে পারে না; তদ্রূপ লাভজনক ব্যবসায় সে করিল বা না করিল, তাহাতে অপরের কিছুই আসে যায় না; উভয়ই অপরের পক্ষে সমান। মানব এই নশ্বর দুনিয়াতে নগন্য ও সামান্য ইবাদত করিয়া থাকে। (যাহা হাজার টাকা স্বরূপ)। এমতাবস্থায়, ইবাদত কার্য করিয়া সে অপরের সম্মানপ্রত্যাশী কিরূপে হইতে পারে? এই শ্রেণীর রিয়া নিতান্ত গুপ্ত ও দুর্বোধ্য।

হযরত আলী কাররামাল্লাহু অজহাহু বলেন, কিয়ামত দিবস মহাপ্রভু আল্লাহ্ কুরআন পাঠকারীদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন- "তোমাদের নিকট কি লোকে সস্তা মূল্যে জিনিসাদি বিক্রয় করে নাই? অতি আগ্রহের সহিত তাহার কি তোমাদের কার্য সমাধা করিয়া দেয় নাই? আর তাহারা কি অগ্রে তোমাদিগকে সালাম দেয় নাই? এই সমুদয়ই তোমাদের ইবাদতের পুরস্কারস্বরূপ (দুনিয়াতে) তোমাদিগকে প্রদান করা হইয়াছে। (কারণ) তোমরা একমাত্র আমার সন্তুষ্টি বিধানের জন্য ইবাদত কার্য কর নাই।" তৎপর যে ব্যক্তি লোকালয় পরিত্যাগপূর্বক নির্জনে আল্লাহ্র ইবাদতে লিপ্ত ছিল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিবে- "লোকসমাজে অবস্থানের ফলে আমার ইবাদত নষ্ট হইয়া যাইবে, এই আশঙ্কায় আমি সমাজ পরিত্যাগ করত নির্জনে ইবাদত করিয়াছি! কারণ, কাহাকেও দেখিলেই আমার বাসনা হইত যে, সে আমাকে সম্মান করুক এবং আমার হক সম্বন্ধে সর্বদা সজাগ থাকুক।

উল্লিখিত কারণেই লোকে যেরূপভাবে পাপ ও অপকর্ম গোপনে ঢাকিয়া রাখে যাঁহারা একমাত্র আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ইবাদত করেন তাঁহারাও তদ্রূপ ইবাদত কার্য ঢাকিয়া রাখিতে সচেষ্ট থাকেন। কারণ, তাঁহারা অবগত আছেন যে, কিয়ামতের দিন যে ইবাদত একমাত্র আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে করা হয়, শুধু তাহাই গৃহীত হইবে এবং তদ্ব্যতীত আর কিছুই কবুল হইবে না। এইরূপ খাঁটি ইবাদতকারীগণকে হজ্জযাত্রীদের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। হজ্জযাত্রীগণ জানে যে, আরব প্রানতরে বিশুদ্ধ স্বর্ণ ব্যতীত গৃহীত হয় না। সুতরাং বিশুদ্ধ স্বর্ণ না দিলে তথায় খাদ্য, পানীয় দ্রব্য ইত্যাদি পাওয়া যায় না বলিয়া বিশুদ্ধ স্বর্ণ ব্যতীত সেই স্থানে জীবন ধারণ সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়ে। এইজন্য হজ্জযাত্রীগণ পূর্বাহ্নেই সঙ্কটাপন্ন দিবসের স্মরণ করত মেকী স্বর্ণ ফেলিয়া দিয়া বিশুদ্ধ স্বর্ণ সংগ্রহে তৎপর হইয়া থাকে। কিয়ামত-দিবস অপেক্ষা অধিক সঙ্কটের দিন মানুষের আর নাই। যে ব্যক্তি এখন এই দুনিয়াতে বিশুদ্ধ ইবাদত না করিবে সে কিয়ামত-দিবসে অতি কঠিন সঙ্কটে নিপত্তি হইবে এবং তখন কেহই তাহাকে সাহায্য করিবে না।

যে পর্যন্ত নিজের ইবাদত চতুষ্পদ জন্তু দেখিতেছে, না মানুষ দেখিতেছে, এই প্রভেদ বিদ্যমান থাকিবে, সেই পর্যন্ত মানব রিয়াশূণ্য হইতে পারে না। রাসূলে মাক্‌বূল

সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "সামান্য এবং গুপ্ত রিয়াও শিরকের মধ্যে গণ্য।" অর্থাৎ এইরূপ করিলেও বস্তুত আল্লাহ্র ইবাদতের সহিত অপরকে শরীক করা হইয়া থাকে। ইবাদত সম্বন্ধে মহাপ্রভু আল্লাহ্ অবগত আছেন, ইহাতে যে ব্যক্তি সন্তুষ্ট হইতে পারে না, তদ্রূপ ইবাদতে অপরের প্রভাব অবশ্যই থাকিবে।

গুপ্ত ইবাদত প্রকাশে আনন্দ স্থলবিশেষে নির্দোষ—মোটের উপর কথা এই যে, যে ব্যক্তি স্বীয় ইবাদত প্রকাশ পাইলে আনন্দিত হয়, সে রিয়াশূণ্য নহে। কিন্তু চারটি কারণে ইবাদত প্রকাশে আনন্দিত হওয়া অবৈধ নহে।

প্রথম কারণ—ইবাদতকারী স্বীয় ইবাদত গোপন রাখিবার ইচ্ছা করিয়াছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইহা প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন, অথচ তাহার সমস্ত পাপ তিনি ঢাকিয়া রাখিয়াছেন। এমতাবস্থায়, তিনি যে তাহার অপকর্ম ঢাকিয়া রাখিয়া সৎকর্ম প্রকাশ করিয়াছেন তৎপ্রতি আল্লাহ্র অপার অনুগ্রহ অনুভব করিয়া যদি সে আনন্দিত হয় এবং লোকের প্রশংসা ও ভক্তিতে তাহার হৃদয়ে আনন্দ জন্মে, তবে এইরূপ আনন্দে কোন দোষ নাই। যেমন আল্লাহ্ বলেন-

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوْا

অর্থাৎ "হে মুহাম্মদ (সা), আপনি বলিয়া দিন, আল্লাহ্র বদান্যতা ও তাঁহার অনুগ্রহ লাভে তোমাদের আনন্দিত হওয়া উচিত" (সূরা ইউনুস, ৬ রুকূ, ১১ পারা)।

দ্বিতীয় কারণ—"আল্লাহ্ যেমন দুনিয়াতে আমার পাপসমূহ গোপন রাখিয়াছেন তদ্রূপ পরকালেও তিনি আমার পাপসমূহ গোপন রাখিবেন'- এই আশায় হৃদয়ে আনন্দের সঞ্চার হইলে কোন দোষ নাই। হাদীস শরীফে উক্ত হইয়াছে, আল্লাহ্ এত দয়ালু যে, তিনি দুনিয়াতে পাপ গোপন রাখিয়া তৎপর পরকালে ইহা প্রকাশ করিয়া তাহার বান্দাকে লজ্জিত করিবেন না।

তৃতীয় কারণ—ইবাদত প্রকাশ করিবার তাহার মোটেই ইচ্ছা ছিল না; বরং তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইহা প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। এমতাবস্থায়, এই ইবাদত দেখিয়া অপর লোকে তাহার অনুকরণ করত সৌভাগ্য লাভ করিবে মনে করিয়া আনন্দিত হওয়াতে কোন দোষ নাই। এমন ব্যক্তিকে গুপ্ত ও প্রকাশ্য, উভয় প্রকার ইবাদতের পূণ্যই প্রদান করা হইবে।

চতুর্থ কারণ—কাহারও ইবাদত দেখিয়া যদি অপর লোকে তাহার প্রশংসা করে ও তাহার প্রতি শ্রদ্ধাবান হইয়া তাহারা আল্লাহ্র ইবাদতে প্রবৃত্ত হয়, আর ইবাদতকারী লোকের ভক্তি ও সম্মান পাইয়া আনন্দিত না হইয়া বরং লোকে আল্লাহ্র ইবাদতে লিপ্ত হইয়াছে দেখিয়া আনন্দিত হয়, তবে এইরূপ আনন্দেও কোন দোষ নাই। কিন্তু অপর উপাসনাকারীর ইবাদত দর্শনেও যদি লোকে তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া আল্লাহ্র

ইবাদতে প্রবৃত্ত হইয়াছে দেখিয়া পূর্বোক্ত ব্যক্তির আনন্দ অটুট থাকে, তবেই তদ্রূপ আনন্দ নির্দোষ বলিয়া পরিগণিত হইবে।

সৎকার্য বিনাশক রিয়া—প্রিয় পাঠক, অবগত হও, রিয়ার বাসনা কোনও সময় ইবাদতের প্রারম্ভে, কখনও ইবাদতের মধ্যে, আবার কোন সময় ইবাদত কার্য সম্পন্ন হওয়ার পর হৃদয়ে উদিত হইয়া থাকে। রিয়ার ভাব ইবাদতের প্রারম্ভে উদিত হইলে ইবাদতকে সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করিয়া ফেলে। কেননা, ইবাদত নিতান্ত বিশুদ্ধ সঙ্কল্পে একমাত্র আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে হওয়া অনিবার্য এবং ইহাতে অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকিলে সঙ্কল্পের বিশুদ্ধতা নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু মূল ইবাদতের সঙ্কল্পে রিয়া না থাকিয়া ইহার কোন অবস্থা বা প্রকারের মধ্যে থাকিলে মূল ইবাদতটি নষ্ট হইবে না। বরং ইহার বিশেষত্বটুকুই নষ্ট হইয়া যাইবে। উদাহরণস্বরূপ মনে কর, এক ব্যক্তি রিয়ার বশীভূত হইয়া লোকের সম্মুখে আউয়াল ওয়াক্তে নামায পড়িবার জন্য ব্যস্ত হয়। কিন্তু সে একাকী নির্জনে থাকিলেও নামায সমাপনে কোন ত্রুটি করে না, যদিও একটু বিলম্বে নামায পড়িয়া থাকে। এমতাবস্থায়, সে আউয়াল ওয়াক্তে নামায পড়িলে যে সওয়াব লাভ করিত ইহা মাত্র নষ্ট হইয়া যাইবে, মূল নামায বিনষ্ট হইবে না। কারণ, মূল নামায সমাপনে তাহার সঙ্কল্প বিশুদ্ধ আছে। যেমন কোন ব্যক্তি যদি অন্যায়ভাবে বলপূর্বক অধিকৃত গৃহে নামায পড়ে তবে নামায অনাদায়ের অপরাধ হইতে সে মুক্তি পাইবে বটে, কিন্তু বলপূর্বক অন্যায়ভাবে অধিকৃত গৃহে নামায পড়ার দরুন তাহাকে অবশ্যই পাপী হইতে হইবে। মূল নামাযের জন্য সে পাপী হইবে না। তদ্রূপ আউয়াল ওয়াক্তে নামায পড়ার উদ্দেশ্যের মধ্যে রিয়া থাকাতে সেই সওয়াবই বিনষ্ট হইবে এবং নামাযের সঙ্কল্প বিশুদ্ধ ছিল বলিয়া উহা নষ্ট হইবে না।

আবার কোন ব্যক্তি বিশুদ্ধ সঙ্কল্পের সহিত নামায সমাপন করিল। কিন্তু নামাযান্তে তাহার অন্তরে রিয়ার ভাব উদয় হওয়ায় সে তাহার গুপ্ত নামায প্রকাশ করিয়া ফেলিল। এমতাবস্থায়, তাহার নামায বিনষ্ট হইবে না। তবে রিয়ার বশবর্তী হইয়া ইবাদত প্রকাশ করিবার জন্য তাহাকে অবশ্যই শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। হাদীস শরীফে উক্ত আছে, এক ব্যক্তি বলিল– "আমি গতকল্য সূরা বাকারাহ পাঠ করিয়াছি।" হযরত ইব্‌ন মাসঊদ রাযিআল্লাহু আনহু ইহা শুনিয়া বলিলেন– "যাহা সে প্রকাশ করিয়া দিল (উক্ত) ইবাদতের মধ্যে ইহাই তাহার প্রাপ্য ছিল।" অর্থাৎ প্রকাশ করার জন্য তাহার কুরআন পাঠের সওয়াব নষ্ট হইয়া গেল। এক ব্যক্তি রাসূলে মাক্‌বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট বলিল– "আমি সর্বদা রোযা রাখিয়া থাকি।" হযরত (সা) বলিলেন– "তুমি রোযা রাখ না, আবার তুমি রোযা ভঙ্গও কর না।" অর্থাৎ রোযা প্রকাশ করাতে ইহার সওয়াব বিনষ্ট হইয়া গেল।

কিন্তু আমাদের মতে উপরিউক্ত হাদীসদ্বয়ের প্রকাশ্য অর্থ এই– রাসূলে মাক্‌বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ও হযরত ইব্‌ন মাসঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বুঝিতে

পারিয়াছিলেন যে, ইবাদতকালে ঐ দুই ব্যক্তির অন্তর রিয়া শূণ্য ছিল না এবং এইজন্যই তদ্রূপ উক্তি করিয়াছিলেন। তাহা না হইলে বিশুদ্ধ সংকল্পের সহিত সমাপনের পর রিয়া দেখা দিলে ইবাদত বিনষ্ট হয় না। শেষোক্ত হাদীস হইতে কোন কোন মুহাদ্দিস এই অর্থও গ্রহণ করিয়াছেন যে, নিরন্তর রোযা রাখা নিষিদ্ধ।

ইবাদতকালে ইহার অভ্যন্তরে যদি রিয়ার ভাব উদিত হয় এবং ইহা এত প্রবল হইয়া উঠে যে, ইবাদতের মূল উদ্দেশ্যই নষ্ট করিয়া ফেলে তবে এমন ইবাদত বিনষ্ট হইয়া যাইবে। মনে কর, বিশুদ্ধ সঙ্কল্পের সহিত এক ব্যক্তি নামায পড়িতে আরম্ভ করিল। এমন সময় কোন মনোহর দৃশ্য তাহার নয়নগোচর হইল বা কোন হারানো দ্রব্যের সন্ধান মিলিল। এমতাবস্থায়, সে একাকী নির্জনে থাকিলে নামায ভাঙ্গিয়া ফেলিত; কিন্তু লোকলজ্জার ভয়ে সে কোন প্রকারে নামায সমাপ্ত করিয়া লইল। এমন নামাযও বিনষ্ট হইয়া যাইবে, কেননা এইরূপ স্থলে ইবাদতের ইচ্ছাই রহিল না, কেবল লোককে দেখাইবার জন্যই সে নামাযে দন্ডায়মান রহিয়াছে। কিন্তু তদ্রূপ স্থলেও যদি ইবাদতের মূল উদ্দেশ্য অটুট থাকে এবং লোকে দেখিতেছে বলিয়া অধিকতর আনন্দের সহিত উত্তমরূপে সে নামায আদায় করে তবে আমাদের মতে ইহাই ঠিক যে, তাহার নামায বিনষ্ট হইবে না যদিও এইরূপ রিয়ার জন্যও সে পাপী হইবে।

কিন্তু মনে কর, এক ব্যক্তি বিশুদ্ধ সঙ্কল্পে নামাযে প্রবৃত্ত হইল। এমন সময় অপর লোকে তাহার নামায দেখিতেছে বলিয়া তাহার হৃদয়ে আনন্দের সঞ্চার হইল। হযরত হারেস মুহাসেবী রাযিআল্লাহু আনহু বলেন যে, এইরূপ ব্যক্তির নামায নষ্ট হইবে, না ইহা আদায় হইয়া যাইবে, তৎসম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে। তিনি আরও বলেন– "এই বিষয়ে ইতঃপূর্বে আমি ইতস্তত করিতেছিলাম। কিন্তু এখন আমার প্রবল ধারণা এই যে, তদ্রূপ ব্যক্তির নামায বিনষ্ট হইয়া যাইবে।" হাদীসে উক্ত আছে যে, এক ব্যক্তি রাসূলে মাক্‌বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট নিবেদন করিল– "আমি স্বীয় ইবাদত গোপন রাখি; কিন্তু ইহা লোকের নিকট প্রকাশিত হইয়া গেলে আমি আনন্দিত হইয়া থাকি।" হযরত (সা) ইহা শুনিয়া বলিলেন– "তুমি দুই প্রকার পুরস্কার লাভ করিবে। প্রথম, ইবাদত গোপন রাখিবার (ইচ্ছার) পুরস্কার এবং দ্বিতীয়, (ইবাদত প্রকাশিত হইলে লোকে অনুকরণে তদ্রূপ ইবাদত করিবে বলিয়া) প্রকাশ্যে ইবাদতের পুরস্কার।" এই হাদীসের উল্লেখ করিয়া কেহ হয়ত আমাদের বিরুদ্ধমত পোষণ করিতে পারে। এমতস্থলে, আমাদের উত্তর এই যে, উক্ত হাদীসখানা মুরসাল এবং ইহার বর্ণনাকারীগণ পরস্পর সংলগ্ন নহে অর্থাৎ বর্ণনাকারীদের তালিকা সংলগ্নভাবে রাসূলে মাক্‌বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছে নাই। আর হযরতের (সা) উক্তির উদ্দেশ্য সম্ভবত এই যে, সেই ব্যক্তির ইবাদত বিশুদ্ধ সঙ্কল্পে যথারীতি সম্পন্ন হওয়ার পর তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইহা প্রকাশ পাইয়াছিল এবং

ইহাতে সে আনন্দ লাভ করিয়াছিল। অথবা হযরত (সা) হয়ত ইহাও বুঝিয়া থাকিবেন যে, তাহার ইবাদত প্রকাশিত হওয়ায় তৎপ্রতি মহাপ্রভু আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও করুণা স্মরণ করিয়া সেই ব্যক্তি আনন্দিত হইয়াছিল; যেমন আনন্দিত হওয়ার সঙ্গত কারণসমূহ ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। উপরিউক্ত হাদীসের অর্থ ইহাও গ্রহণ করা যাইতে পারে যে, স্বীয় ইবাদত লোকের নিকট প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া যে ব্যক্তি আনন্দিত হয়, তাহার সেই ইবাদতে পাপ হউক বা না হউক, কিন্তু ইহাতে যে পূণ্য বৃদ্ধি পাইবে, ইহা কেহই বলিতে পারে না। এই পর্যন্ত হযরত হারেস মুহাসেবীর (রা) অভিমত বর্ণিত হইল। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় ইহাই বুঝা যায় যে, নামায বিশুদ্ধ সঙ্কল্পে ঠিকভাবে চলিতেছে, এমন সময় লোকে দেখিলে যদি আনন্দ জন্মে এবং ইহাতে নামাযের অন্তর্গত আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-কলাপের তারতম্য না ঘটে তবে নামায বিনষ্ট হইবে না।

রিয়াজনিত আন্তরিক ব্যাধির প্রতিকার

প্রিয় পাঠক, জানিয়া রাখ, রিয়া মানব-হৃদয়ের নিতান্ত মারাত্মক ব্যাধি এবং ইহার প্রতিকার করা অবশ্য কর্তব্য। অসীম যত্ন ও বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন না করিলে এই ব্যাধি হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যায় না। কেননা, ইহা মানব-হৃদয়ে প্রবেশ করত ইহার সহিত বিজড়িতভাবেই মিলিয়া বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে এবং এই জন্যই ইহা হইতে অব্যাহতি লাভ নিতান্ত দুষ্কর। রিয়া-ব্যাধি এ বিপজ্জনক ও কঠিন হওয়ার কারণ এই যে, শৈশবকাল হইতেই মানব অপরকে তাহার চতুর্দিকে একে অন্যের সম্মুখে সাজিয়া গুজিয়া এবং নিজের গুণাবলী অপরের নিকট প্রকাশ করিয়া সুখ্যাতি অর্জনে ব্যস্ত দেখিতে পায়। অধিকাংশ লোক বা সাধারণভাবে সকলেই রিয়া রোগে আক্রান্ত রহিয়াছে এবং তাহাদের সংশ্রবে থাকিয়া ইহা শিশু সন্তানদের অন্তরে বদ্ধমূল হইয়া পড়ে ও প্রত্যহ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তৎপর বুদ্ধি পরিপক্ক হইলে তাহারা বুঝিতে পারে যে, এই রোগ বিষম ক্ষতিকর। এইরূপ প্রদর্শনেচ্ছা প্রবল হইয়া অভ্যাসে পরিণত হইয়া গেলে ইহা বিদূরিত করা নিতান্ত দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। কেহই রিয়া শূণ্য নহে এবং ইহা হইতে পরিত্রাণের নিমিত্ত অসীম সাধনা ও পরিশ্রম করা সকলের পক্ষেই অবশ্য কর্তব্য।

রিয়ার ব্যাধির প্রতিকার ব্যবস্থা

রিয়া-ব্যাধির দুই প্রকার প্রতিকার ব্যবস্থা আছে। **প্রথম**—বহিষ্কারক ব্যবস্থা ও দ্বিতীয়—উপশমমূলক ব্যবস্থা।

রিয়া বহিষ্কারক ব্যবস্থা—ইহা জোলাপের ন্যায় রিয়ারূপ ব্যাধির মূল অন্তর হইতে বাহির করিয়া দেয়। ইহা ইলম (জ্ঞান) ও আলিমের (অনুষ্ঠানের) মিশ্রণে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

রিয়া বহিষ্কারক জ্ঞানমূলক ব্যবস্থা—এই কথা সুন্দরভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়া লওয়া যে, মানব তাহার সমুদয় ক্রিয়া-কলাপ সুখাস্বাদ ও আনন্দ উপভোগের উদ্দেশ্যেই করিয়া থাকে। কিন্তু সে যদি জানিতে পারে যে, কোন বিশেষ কাজের দরুন পরকালে তাহার অপূরণীয় ক্ষতি হইবে এবং তজ্জন্য তাহাকে অসহনীয় যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে, তবে তদ্রূপ কাজ আনন্দদায়ক হইলেও ইহা পরিত্যাগ করা তাহার পক্ষে সহজসাধ্য হইয়া পড়ে। যেমন, মনে কর, এক পাত্র মধু দেখিয়া কোন ব্যক্তি যতই ইহার প্রতি প্রলুব্ধ হউক না কেন, সে যদি জানিতে পারে যে, ইহাতে হলাহল বিষ মিশ্রিত রহিয়াছে, তবে তৎক্ষণাৎ সে ইহা পরিত্যাগ করিবে। প্রভুত্ব-প্রিয়তা ও সম্মান-লিপ্সারূপ মূল শিকড় হইতে রিয়া উৎপন্ন হইয়া থাকিলেও এই মূল শিকড় হইতে আবার তিনটি শিকড় বহির্গত হইয়াছে। **প্রথম**—প্রশংসা-প্রীতি, **দ্বিতীয়**—নিন্দা-ভীতি ও **তৃতীয়**—পরপ্রত্যাশী হওয়া। এই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই এক আরব পল্লীবাসী রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করিয়া নিবেদন করিল– "আপনি ঐ ব্যক্তি সম্বন্ধে কি বলেন, যে ধর্মের জন্য জিহাদ করে বা নিজের বাহাদুরী প্রদর্শন অথবা প্রশংসা লাভের উদ্দেশ্য ধর্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়?" হযরত (সা) বলিলেন– "যে ব্যক্তি কলমায়ে তাওহীদ (একত্ববাদ) সমুন্নত করিবার উদ্দেশ্যে জিহাদে প্রবৃত্ত হয়, সে আল্লাহ্‌র পথে আছে।" মানুষ যেন প্রশংসা-প্রিয়, সম্মান-লোলুপ বা নিন্দা-ভীত না হয়, তৎপ্রতি এই হাদীসে ইঙ্গিত রহিয়াছে। অন্যত্র রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন– "যে ব্যক্তি উষ্ট্র বন্ধনের নগণ্য রশি পাওয়ার উদ্দেশ্যে জিহাদে প্রবৃত্ত হয়, সে ঈপ্সিত রশিটুকু ব্যতীত আর কিছুই পাইবে না।" এই হাদীসদ্বয় হইতে ইহাই বুঝা যায় যে, উপরিউক্ত তিনটি কারণেই রিয়ার উদ্ভব হইয়া থাকে।

রিয়া বহিষ্কারক জ্ঞানমূলক ব্যবস্থার প্রথম পর্যায়—প্রশংসা-প্রীতি অন্তর হইতে মুছিয়া ফেলিবে এবং চিন্তা করিয়া বুঝিয়া লইবে যে, কিয়ামত দিবসে সকল মানুষ, জ্বিন ও ফেরেশ্‌তার সম্মুখে রিয়াকারদিগকে ডাকিয়া বলা হইবে– "রে রিয়াকার, ওরে পাপী, ওরে পথভ্রান্ত! তোর কি লজ্জা নাই? তুই আল্লাহ্‌র ইবাদতের বিনিময়ে কিরূপে লোকের প্রশংসা ক্রয় করিলি? তুই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনা না করিয়া লোকের মনস্তুষ্টির জন্য ব্যস্ত হইলি। মানুষের ভালবাসা লাভের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌র প্রসন্নতা হইতে দূরে সরিয়া পড়িলি। আল্লাহ্‌র ভালবাসার উপরে মানুষের ভালবাসাকে স্থান দিলি। লোকের প্রশংসা পাওয়ার লালসায় আল্লাহ্‌র নিন্দাকে তুচ্ছ জ্ঞান করিলি। আল্লাহ্‌র নিকট তোর চেয়ে অধিক লাঞ্ছিত আর কেহই ছিল না: কেননা তুই সকলের

মনস্তুষ্টি করিতে চাহিয়াছিলি; কিন্তু মহাপ্রভু আল্লাহ্‌র ক্রোধের ভয় করিস নাই।" যাহাদের কিঞ্চিত মাত্রও বুদ্ধি আছে তাহারা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবে যে, ইবাদত প্রকাশ করিয়া লোকের নিকট হইতে যে প্রশংসা পাওয়া যায়, তাহা মহাপ্রভু আল্লাহ্‌র এই প্রকার তীব্র লাঞ্ছনা ও দুর্বহ তিরস্কারের তুলনায় কত নগণ্য। আরও বিবেচনা করিয়া দেখ, ইবাদত পুণ্যের পাল্লা ভারী করে। কিন্তু ইবাদতে রিয়া প্রবিষ্ট হইলে ইহার পূণ্য বিনষ্ট হইয়া যায় এবং ফলে পাপের পাল্লা ভারী হইয়া পড়ে। তৎপর ভাবিয়া দেখ, যে ব্যক্তি রিয়া না করিবে সে পরকালে নবী ও ওলীগণের সঙ্গে বেহেশতে থাকিবে; অপরপক্ষে, রিয়াকারগণ দোযখের ফেরেশতাগণের নিকট বন্দী হইয়া আল্লাহ্‌র রহমত হইতে বঞ্চিত লোকদের সহিত দোযখে নিক্ষিপ্ত হইবে।

আবার ভাবিয়া দেখ, অপরের মনস্তুষ্টির জন্যই লোকে রিয়া করিয়া থাকে। কিন্তু তদ্দ্বারা সকলের মনতুষ্টি অর্জন করা যায় না; একজন সন্তুষ্ট হইলে অপরজন অসন্তুষ্ট হইয়া উঠে; একজন প্রশংসা করিলে অপরজন নিন্দা করে। আর সকল লোকেই যদি তোমার প্রশংসা কীর্তন করে তবেই-বা তোমার কি লাভ? তাহাদের হস্তে কি তোমার জীবিকা আছে? না, তোমার পরমায়ুর উপর তাহাদের কোন ক্ষমতা চলে? না, তোমার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সৌভাগ্যের ভার তাহাদের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে? এমতাবস্থায়, অপরের মনতুষ্টির জন্য এই নশ্বর জগতে নিজকে সর্বদা ব্যতিব্যস্ত রাখা এবং প্রশংসা লাভের হীন প্রবৃত্তির বশবর্তী হইয়া নিজকে পরকালের কঠিন আযাবে নিপতিত করা নিতান্ত মূর্খতা। এই প্রকার জ্ঞান ও চিন্তা হৃদয়ে সর্বদা জাগ্রত রাখা কর্তব্য।

রিয়া বহিষ্কারক জ্ঞানমূলক ব্যবস্থার দ্বিতীয় পর্যায়—অপরের নিকট হইতে কিছু পাওয়ার লোভ অপসারণ করিতে হইবে। ইহার ব্যবস্থা 'ধনাসক্তি' নামক ষষ্ঠ অধ্যায়ে প্রদান করা হয়েছে। তদ্ব্যতীত ইহাও বুঝিয়া লইবে যে, তুমি অপরের নিকট হইতে যাহা পাইতে লালায়িত তাহা তুমি পাইতেও পার অথবা নাও পাইতে পার। আর পাইলেও তজ্জন্য তোমাকে অপমান, লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে এবং অপরপক্ষে, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভে তুমি বঞ্চিত থাকিবে। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতীত লোকের অন্তর কাহারও বশীভূত হয় না। তুমি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভে সমর্থ হইলে তিনি স্বতঃই লোকের মন তোমার আজ্ঞাধীন করিয়া দিবেন। আর তুমি আল্লাহ্‌র সন্তোষ অর্জন করিতে না পারিলে তোমার প্রতি তাঁহার তিরস্কার ও লাঞ্ছনা আপনা আপনিই প্রকাশ হইয়া পড়িবে এবং রিয়াকার কপট বলিয়া লোকেও তখন তোমাকে ঘৃণা করিতে থাকিবে।

রিয়া বহিষ্কারক জ্ঞানমূলক ব্যবস্থার তৃতীয় পর্যায়—নিন্দা-ভীতি বিদূরিত করিতে হইবে। তাহার উপায় এই– তুমি নিজকে সম্বোধন করিয়া বলিবে, "আমি আল্লাহ্‌র নিকট সৎ ও প্রশংসিত হইতে পারিলে লোকের নিন্দায় আমার বিন্দুমাত্রও

অনিষ্ট হইতে পারে না। কিন্তু আল্লাহ্‌র নিকট আমি ঘৃণিত ও অপমানিত হইলে দুনিয়ার সকল লোকের প্রশংসায়ও আমার কোন লাভ নাই।" আর যদি বিশুদ্ধ সঙ্কল্পে একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য তুমি ইবাদত কর এবং লোকের মনস্তুষ্টির জন্য তুমি উদ্বিগ্ন না হও, তবে আল্লাহ্ তাহাদের অন্তরে তোমার প্রতি ভালবাসা জন্মাইয়া দিবেন। অন্যথায়, তাহারা অনতি বিলম্বে তোমার রিয়া ও কপটতা ধরিয়া ফেলিবে এবং যে নিন্দার ভয়ে তুমি ভীত হইতেছিলে ইহাই চতুর্দিক হইতে আসিয়া তোমাকে ঢাকিয়া লইবে। আর রিয়া-দোষে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি হয়ত তুমি ইতিপূর্বে হারাইয়া থাকিবে। পক্ষান্তরে, তুমি যদি নিজের মনকে এক প্রাণে এক ধ্যানে শুধু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ইবাদত-কার্যে নিবিষ্ট রাখ তবে লোকে তোমার সম্বন্ধে কি বলিতেছে, ইহা ভাবিয়া তোমাকে উদ্বিগ্ন হইতে হইবে না এবং তোমার অন্তর হইতে উৎকণ্ঠা বিদূরিত হইবে। তুমি এইরূপ উন্নত অবস্থায় উপনীত হইতে পারিলে স্বর্গীয় আলোকপুঞ্জে তোমার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে এবং তখন আল্লাহ্‌র করুণা, সাহায্য ও দান অবিরাম ধারায় তোমার উপর বর্ষিত হইতে থাকিবে। সেই সময়ে সংকল্পের শক্তিও ক্রমশ বৃদ্ধি পাইবে এবং ইহার সুখাস্বাদও তুমি উত্তরোত্তর অধিক পরিমাণে উপভোগ করিতে থাকিবে।

রিয়া বিনাশক অনুষ্ঠানমূলক ব্যবস্থা—লোকে যেমন অতি সাবধানে স্বীয় পাপ গোপন করিয়া রাখে, তদ্রূপ তুমি তোমার ইবাদত ও সৎ কার্যসমূহ গোপন করিয়া রাখিবে। তাহা হইলে একমাত্র আল্লাহ্‌ই যে তোমার কার্যাবলী পরিদর্শন করিতেছেন, ইহা ভাবিয়া তুমি পরিতুষ্ট থাকিতে পারিবে। প্রাথমিক অবস্থায়, ইহা দুষ্কর বলিয়া মনে হইলেও যত্ন এবং পরিশ্রম সহকারে করিতে আরম্ভ করিলেই ইহা সহজসাধ্য হইয়া উঠে। সেই সময় আল্লাহ্‌র নিকট নির্জন মুনাজাত ও আন্তরিকতার মাধুর্য উপভোগ আসিয়া থাকে; অবশেষে মনের এই অবস্থা হয় যে, লোকে তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও সে তখন তাহাদের প্রতি একেবারে উদাসীন হইয়া পড়ে।

রিয়া উপশমমূলক ব্যবস্থা—রিয়ার ভাব হৃদয়ে উদয় হওয়া মাত্র ইহা দূর করিতে তৎপর হইবে। যদিও সাধনাবলে প্রশংসা-প্রীতি ও অপরের নিকট হইতে প্রাপ্তি-লোভ বিদূরিত হয় এবং পার্থিব সমুদয় বস্তু মানবের নিকট হেয় ও তুচ্ছ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তথাপি ইবাদতের মধ্যে শয়তান তাহার হৃদয়ে রিয়ার ভাব জাগাইয়া তোলে। তিন শ্রেণীর ভাব তখন হৃদয়ে উদিত হইয়া থাকে। **প্রথম**–ইবাদতে প্রবৃত্ত হইলে এই ভাবটি হৃদয়ে জাগিয়া উঠে– "লোকে হয়ত আমার এই ইবাদত জানিতে পারিয়াছে; অথবা, আশা করি জানিতে পারিবে।" **দ্বিতীয়**– ইবাদতকারীর হৃদয়ে এই ভাবপ্রবণতা দেখা দেয় যে, ইবাদত প্রকাশ পাইলে লোকে তাহাকে সম্মান করিবে। **তৃতীয়**– তৎপর উক্ত ভাবপ্রবণতা অনুযায়ী লোকে তাহাকে সম্মান প্রদর্শন করিতেছে কিনা, ইহার অনুসন্ধানে তৎপর হয়।

যাহাই হউক, প্রথম ভাবটি হৃদয়ে উদিত হইলেই ইহা দূর করিবার চেষ্টা করিবে। তাহার উপায় এই যে, মনে মনে বলিবে– "লোকের জানাতে আমার কি লাভ? মহাপ্রভু আল্লাহ্ স্বয়ং যখন সবকিছু দেখিতেছেন ও জানিতেছেন, তখন ইহাই ত আমার জন্য যথেষ্ট। আমার কোন কার্যই ত মানুষের ক্ষমতাধীন নহে।" তৎপর ইবাদত প্রকাশ পাইলে লোকে সম্মান করিবে, এই দ্বিতীয় ভাবটি হৃদয়ে প্রকট হইয়া উঠিলেও তদ্রূপ চিন্তা করিবে। ইহার সঙ্গে-সঙ্গে উল্লিখিত তৃতীয় ভাবটিও হয়ত দেখা দিবে। তুমি হৃদগতভাবে বুঝিয়া লইবে যে, রিয়া করিলে মহাপ্রভু আল্লাহ্ তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট ও ক্রুদ্ধ হন, এমতাবস্থায়, লোকের প্রশংসা তোমার কি উপকার করিতে পারিবে? এইরূপ চিন্তা করিতে থাকিলে রিয়ার প্রতি তোমার হৃদয়ে ঘৃণার উদ্রেক হইবে। তোমার পূর্বোক্ত মনোভাব তোমাকে প্রশংসা-প্রীতির দিকে আকর্ষণ করিবে, অপরপক্ষে, রিয়ার প্রতি তোমার ঘৃণা তোমাকে প্রশংসা-প্রীতির দিকে আকৃষ্ট হইতে দিবে না। অতএব এই আকর্ষণ ও ঘৃণার মধ্যে যে ভাবটিই অধিকতর সবল ও মজবুত হইয়া উঠিবে, ইহা তোমার মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিবে।

উপরিউক্ত তিনটি ভাব দমন করিবার জন্য তুমি আরও তিনটি কার্য সম্পন্ন করিবে। তাহা এই– (১) হৃদয়ে এই জ্ঞান বদ্ধমূল করিয়া লইবে যে, রিয়ার অপরাধে তুমি আল্লাহ্র অভিশাপ ও ক্রোধে নিপতিত হইবে; (২) এই জ্ঞানের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ তোমার হৃদয়ে রিয়ার প্রতি যে ঘৃণার উদ্রেক হইবে ইহাকে তীব্র করিয়া তুলিবে এবং (৩) তৎপর রিয়ার ভাব হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেলিবে। মানবমনের এইরূপ চরম অধোগতিও হইয়া থাকে যে, রিয়ার ভাব সমস্ত অন্তররাজ্য অধিকার করিয়া ফেলে এবং তখন উক্ত ব্যবস্থানুযায়ী শত চেষ্টা সত্ত্বেও ইহার জঘন্যতার জ্ঞান ও তৎপ্রতি ঘৃণা হৃদয়ের চতুঃসীমায়ও প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। যাহার এই অবস্থা সে শয়তানের বন্ধু হইয়াছে। তাহার দৃষ্টান্ত এইরূপ– মনে কর, এক ব্যক্তি সহিষ্ণুতা গুণ প্রচুর পরিমাণে অর্জন করিয়াছে এবং ক্রোধের আপদসমূহ সম্যকরূপে সে উপলব্ধি করিয়া লইয়াছে। কিন্তু ক্রোধের সময় সে সব কিছু ভুলিয়া একেবারে দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূণ্য হইয়া পড়ে।

তদ্রূপ, কোন ব্যক্তি হয়ত রিয়ার জঘন্যতা জ্ঞান অর্জন করিয়াছে এবং সে রিয়াকে রিয়া বলিয়া চিনিতেও পারিতেছে। কিন্তু তাহার অন্তরে রিয়ার ভাব আসিলে তৎপ্রতি ঘৃণার উদ্রেক হইল না। আবার কখন কখনও ঘৃণার উদ্রেক হইলেও রিয়ার ভাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ী হইবার মত বলে সে বলীয়ান হইতে পারে না এবং তখন সে লোকের প্রশংসা লাভের উদ্দেশ্যে কার্য করিতে থাকে। আলিমদের মধ্যে এমন বহু লোক আছেন, যাঁহারা সম্যকরূপে অবগত আছেন যে, তাঁহারা রিয়ার বশীভূত হইয়া লোকের সহিত কথাবার্তা বলিতেছেন এবং বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতেছেন। ইহা তাঁহাদের জন্য নিতান্ত অনিষ্টকর হওয়া সত্ত্বেও তাঁহারা তদ্রূপ কার্য করিয়া চলিয়াছেন এবং তওবা করিয়া ইহা হইতে প্রত্যাবর্তন করিতে অযথা বিলম্ব করিতেছেন।

উল্লিখিত বর্ণনা হইতে বুঝা যাইতেছে, রিয়ার প্রতি যে ঘৃণা জন্মে ইহার শক্তির তারতম্যানুসারে রিয়া দমন হইতে পারে। (অর্থাৎ রিয়ার প্রতি আন্তরিক ঘৃণা যত প্রবল হইবে ততই রিয়া দমন হইবে)। রিয়ার জঘন্যতা-জ্ঞানের তীব্রতার অনুপাতে ইহার প্রতি ঘৃণার ভাব উদ্রেক হইয়া থাকে। এই জ্ঞান আবার ঈমানের বলের তারতম্যানুসারে দুর্বল বা প্রবল হইয়া উঠে এবং ফেরেশতার সাহায্যেও ঈমান বলীয়ান হইয়া থাকে। অপরপক্ষে, সংসারাসক্তির তারতম্যানুসারে রিয়া উৎপন্ন হয় এবং শয়তানের সাহায্যে ইহা শক্তিমান হইয়া উঠে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, মানব-মন দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী সৈন্যদলের মধ্যস্থলে অবস্থিত এবং এই দলের সহিতই ইহার সম্বন্ধ আছে। অনন্তর যে দলের সহিত সম্বন্ধ প্রবল, সেই দলের প্রতিক্রিয়াই তাহার অন্তরে অধিক প্রতিফলিত হয় এবং সে তৎপ্রতিই অধিক ঝুঁকিয়া পড়ে। হৃদয়ের এই সম্বন্ধটুকু নতুন নহে; পূর্ব হইতেই ইহা তাহার মনে লাগিয়া রহিয়াছে। কারণ, নামাযের প্রারম্ভেই মানব আপন মনকে এমন করিয়া লয় যে, ফেরেশ্‌তার স্বভাব বা শয়তানের স্বভাব তাহার উপর প্রবল হইয়া উঠে। অতএব ইবাদতের মধ্যে তাহার ঐ আদি সম্বন্ধটুকুই প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং শয়তান বা ফেরেশ্‌তার সহিত তাহার পূর্ব সম্বন্ধের আধিক্য অনুসারে ভাগ্য নির্ধারণকালে তাহার জন্য যে স্থান নির্দিষ্ট রহিয়াছে তকদীর তাহাকে সেই স্থানেই টানিয়া লইয়া যায়।

রিয়ার মূলোচ্ছেদে অক্ষম হইলে ইহা দমনে মঙ্গল– প্রিয় পাঠক, তুমি রিয়ার নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া যখন তৎপ্রতি তীব্রঢ় ঘৃণা পোষণ করিতে পারিবে তখন তোমার অন্তরে রিয়ার ইচ্ছা অবশিষ্ট থাকিলেও আল্লাহ্র বিচারে তুমি অপরাধী বলিয়া গণ্য হইবে না; কেননা উহা মানব প্রকৃতির সহিত জড়িত রহিয়াছে। আর যাহা তোমার প্রকৃতির সহিত মিশ্রিত রহিয়াছে, ইহাকে একেবারে নির্মূল করিতে তোমাকে আদেশ করা হয় নাই; বরং ইহাকে দমন করিয়া আজ্ঞাধীন করিতে তুমি আদিষ্ট হইয়াছ, যেন এই কুপ্রবৃত্তি তোমাকে দোযখে লইয়া যাইতে না পারে। কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারিলেই তুমি ইহাকে দমন করিলে এবং ইহাই তোমার জন্য যথেষ্ট। কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণই ইহার প্রায়শ্চিত্ত। ইহার প্রমাণ এই যে, একদা সাহাবাগণ (রা) রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট নিবেদন করিলেন– "আমাদের অন্তরে বহু অমূলক চিন্তা ও সন্দেহের উদ্রেক হয়। তৎসমুদয়ের পরিবর্তে যদি আমাদিগকে আকাশ হইতে নিক্ষেপ করিয়া ফেলা হইত, ইহা বরং বহুগুণে ভাল হইত। আমরা এই সকল অমূলক খেয়ালকে বড় ঘৃণা করিয়া থাকি।" হযরত (সা) বলিলেন– "ইহা ঈমানের প্রকাশ্য নিদর্শন।" সাহাবাগণের (রা) মনে আল্লাহ্র সম্বন্ধে অমূলক খেয়ালের উদ্রেক হইয়াছিল এবং তৎপ্রতি ঘৃণাকে প্রকাশ্য ঈমান ও উহার প্রায়শ্চিত্ত বলা হইয়াছে। সুতরাং সৃষ্ট মানবের সম্বন্ধে যে সকল খেয়াল উদ্রেক হয়, তৎসমুদয়ের প্রতি ঘৃণা উহাদের প্রায়শ্চিত্ত হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহের কারণ নাই।

অমূলক চিন্তার আগমনে মানুষের কর্তব্য—ব্যক্তি বিশেষের মনে অমূলক চিন্তার উদয় হওয়া মাত্র সে ইহার বিরুদ্ধাচরণে সমর্থ হইয়া থাকে। কিন্তু মানবের চিরশত্রু শয়তান তখন হিংসার বশীভূত হইয়া তাহাকে প্ররোচিত করিয়া বলে– "এই সন্দেহ দূরীকরণের মধ্যে তোমার উন্নতি নিহিত রহিয়াছে। যুক্তি-তর্কে ইহা খন্ডন করিয়া লও।" ইহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া অমূলক সন্দেহের পিছনে পড়িলে মুনাজাতের মাধুর্য বিনষ্ট হইয়া যায়। অস্‌অসা অর্থাৎ অমূলক সন্দেহ বা চিন্তা উপস্থিত হইলে মানুষের চারি প্রকার অবস্থা হইয়া থাকে। **প্রথম**—কেহ উহা খন্ডনার্থ যুক্তি-তর্কে অবতীর্ণ হইয়া মূল্যবান সময় অনর্থক নষ্ট করে। **দ্বিতীয়**—কেহ তর্ক-বিতর্কে প্রবৃত্ত হয় না, তদ্রূপ সন্দেহকে অমূলক বুঝিয়া পরিত্যাগ করে এবং মুনাজাতে (ও নিজ কার্যে) লিপ্ত হয়। **তৃতীয়**—কেহ সেই সন্দেহকে অমূলক মনে করিয়া ইহা দমনে তৎপর হয় না; কেননা ইহাতেও অনর্থক সময় অপচয় হইয়া থাকে। বরং সে তৎপ্রতি ভ্রুক্ষেপও না করিয়া মুনাজাতে প্রবৃত্ত হয়। **চতুর্থ**—কেহ কেহ আবার অস্‌অসা আসিতেছে বুঝিতে পারিলেই বিশুদ্ধ সংকল্পের মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া ইবাদত কার্যে অধিকতর তৎপর হইয়া উঠে। তাহারা ভালরূপে অবগত আছে যে, শয়তান ক্রুদ্ধ ও হতাশ হইয়া তখন তদ্রূপ লোকের অন্তরে সন্দেহ নিক্ষেপ করা হইতে বিরত থাকে এবং তজ্জন্য তাহারা উহার প্রতি মোটেই কর্ণপাত করে না। এই সোপানে উপনীত হইতে পারিলেই মানবাত্মা চরম উন্নতি লাভ করে।

উপরিউক্ত চারিটি অবস্থা বুঝাইবার জন্য একটি দৃষ্টান্তের অবতারণা করা যাইতেছে। মনে কর, চারি ব্যক্তি বিদ্যার্জনের নিমিত্ত বিদেশ যাত্রা করিল। এমন সময় জনৈক ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তি পথে দন্ডায়মান হইয়া তাহাদের একজনকে বিদেশ গমনে বাধা প্রদান করিল। কিন্তু সে তাহার কথা না মানিয়া তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল এবং এইরূপে অনর্থক তর্ক-বিতর্ক ও যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া স্বীয় সময় নষ্ট করিল। ইহার পর সেই ঈর্ষাপরায়ণ লোকটি দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বিদেশ গমনে বাধা দিল। সে তর্ক-বিতর্কে তাহাকে পরাস্ত করিয়া নিজ পথে চলিয়া গেল; কিন্তু যুদ্ধে লিপ্ত হইল না। তৎপর তৃতীয় ব্যক্তিকে বাধা প্রদান করা হইলে সে কোন প্রকার তর্ক-বিতর্কে প্রবৃত্ত হইল না। বরং সে তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া পূর্ববৎ স্বীয় গন্তব্য পথে চলিয়া গেল, যেন অনর্থক তাহার সময় নষ্ট না হয়। অবশেষে ঐ ঈর্ষাপরায়ণ লোকটি চতুর্থ ব্যক্তিকেও বিদেশ গমনে নিষেধ করিল। কিন্তু সে তৎপ্রতি মোটেই লক্ষ্য না করিয়া অতি দ্রুত বেগে স্বীয় পথ অতিক্রম করিয়া গেল। এমতাবস্থায়, উক্ত ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তি প্রথম দুইজনকে বাধা দিয়া প্রকারান্তরে সে তাহার উপকার সাধন করিল, তাহার কোন ক্ষতি করা ত দূরে থাকুক। প্রথম তিনজনকে বাধা প্রদান করিয়া ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তি লজ্জিত হইবে না; কিন্তু চতুর্থ জনকে নিষেধ করিয়া সে লজ্জা ও ক্ষোভে বলিবে– "হায়, তাহাকে বরং বাধা প্রদান না করিলেই ভাল হইত।" মোটের উপর কথা এই যে, শয়তানের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়াই সমীচীন নহে।

স্থলবিশেষে ইবাদত প্রকাশের বিধান—প্রিয় পাঠক, অবগত হও, ইবাদত গোপন রাখিলে এই লাভ হয় যে, রিয়ার আপদ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। কিন্তু ইবাদত প্রকাশ পাইলে সর্বাপেক্ষা বড় উপকার এই যে, অপর লোকে ইবাদতকারীর অনুসরণ করিবে এবং এইরূপে জগতে অধিক পরিমাণে ইবাদতের প্রচলন হইবে। এই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই উভয় প্রকার সৎকার্যের প্রশংসা করিয়া আল্লাহ্ বলেন–

اِنْ تُبْدُ وَالصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِىَ وَاِنْ تُخْفُوْهَا وَ تُؤْتُوْهَا الْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ -

"তোমরা যদি প্রকাশ করিয়া সদকাসমূহ প্রদান কর তথাপি ভাল কথা; কিন্তু যদি উহার গোপনীয়তা অবলম্বন কর ও ফকীরদিগকে দান কর, তবে ইহা তোমাদের জন্য উত্তম" (৩৭ রুকূ, সূরা বাকারাহ্, ৩ পারা)। একদা রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কিছু অর্থ চাহিলে এক আনসারী এক থলিপূর্ণ অর্থ লইয়া আগমন করিল। ইহা দেখিয়া অপর লোকেও অর্থ আনিতে আরম্ভ করিল। তখন হযরত (সা) বলিলেন– "যে ব্যক্তি কোন সৎপ্রথা প্রচলন করে এবং লোকে (ইহা দেখিয়া) তাহার অনুকরণ করে, সেই ব্যক্তি নিজ কার্যের সওয়াব ত পাইবেই তদুপরি অপর লোকে তাহার অনুসরণ করিয়া যে সওয়াব পাইবে সেই পরিমাণ সওয়াবও সে লাভ করিবে।"

তদ্রূপ, কোন হজ্জযাত্রী যদি স্বীয় পাথেয় সংগ্রহ করিয়া গৃহের বহির্গত হয় যাহাতে অপর লোকও তাহাকে দেখিয়া হজ্জব্রত পালনের জন্য উদগ্রীব হইয়া উঠে এবং অপর লোকে সাড়া পাইলে জাগ্রত হইয়া তাহাজ্জুদ নামাযে প্রবৃত্ত হইবে, এই উদ্দেশ্যেও যদি কোন তাহাজ্জুদ নামাযী আওয়ায উচ্চ করে, এমতস্থলে, উহা রিয়ার অন্তর্ভুক্ত হইবে না; বরং ইহাতে প্রচুর সওয়াব ও পুরস্কার পাওয়া যাইবে। মোটের উপর কথা এই যে, মনে কোন রিয়ার আশঙ্কা না থাকিলে অপরের হৃদয়ে সৎকার্যের প্রতি উৎসাহ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ইবাদত প্রকাশ করা উত্তম কার্য এবং ইহাতে প্রচুর সওয়াব মিলিবে। কিন্তু ইহাতে রিয়ার লোভ বাড়িয়া উঠিলে অপরকে সৎকার্যে উদ্বুদ্ধ করিয়া কোন উপকারই হইবে না। এইরূপ ব্যক্তির পক্ষে সৎকার্য গোপন রাখাই উত্তম ব্যবস্থা।

ইবাদত প্রকাশ মঙ্গলজনক হওয়ার অবস্থা—ইবাদত প্রকাশ করিতে চাহিলে এমন স্থলেই করা উচিত যথায় ইবাদতকারীকে দেখিয়া অপর লোকের মনে তদ্রূপ কার্য সম্পাদনের বাসনা জন্মিবার প্রবল সম্ভাবনা থাকে। কারণ, স্থানবিশেষে দেখা যায় যে, স্বীয় পরিবারস্থ লোকজন তাহার সৎকার্য অনুকরণ করে বটে, কিন্তু অন্যান্য লোকে তাহার অনুকরণ করে না। আবার ইবাদতকারীর পক্ষে স্বীয় অন্তরের প্রতিও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। কারণ, অধিকাংশ সময় রিয়ার বাসনা অতি সংগোপনে

তাহার অন্তরে লুক্কায়িত থাকে এবং অপরলোক তাহার অনুকরণে সৎকার্যে প্রবৃত্ত হইবে, এই ভান করিয়া সে স্বীয় ইবাদত প্রকাশ করে। এইরূপে সে রিয়ার কবলে পতিত হইয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এমন লোককে ঐরূপ ব্যক্তির সহিত তুলনা করা যাইতে পারে, যে সাঁতার জানে না এবং পানিতে নিমজ্জিত হয়, অথচ সে অপরকে উদ্ধারের নিমিত্ত তাহার হস্ত ধারণ করে এবং ফলে উভয়েই ডুবিয়া মরে। অপরকেও উদ্ধার করিতে সক্ষম হন। নবী ও ওলীগণই এই শ্রেণীর অন্তর্গত। অতএব আত্মগর্বে মাতিয়া উঠিয়া যে ইবাদত গোপন রাখা চলে তাহা প্রকাশ করা যেমন-তেমন লোকের পক্ষে উচিত নহে।

ইবাদত প্রকাশে রিয়াহীনতার নিদর্শন—ইবাদত প্রকাশে রিয়া আছে কিনা, তাহা বুঝিবার উপায় এই- মনে কর, ইবাদত কার্যে লোকের উৎসাহ বাড়াইবার নিমিত্ত তুমি তোমার ইবাদত প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, এমন সময় যদি কেহ তোমাকে বাধা দিয়া বলে- 'তোমার ইবাদত গোপন রাখ, লোকে অমুক ব্যক্তির উপদেশ শ্রবণ ও তাঁহার অনুকরণ করুক', তখন যদি তুমি সন্তুষ্ট চিত্তে নীরব থাকিতে পার তবে বুঝিবে তোমার অন্তরে রিয়ার ভাব নাই। এরূপ স্থলে তুমি স্বীয় ইবাদত প্রকাশ করিয়া যে সওয়াব পাইতে তাহাই পাইবে। এমতাবস্থায়ও যদি স্বীয় ইবাদত প্রকাশের জন্য লালায়িত হও তবে অবশ্যই বুঝিবে যে, তোমার অন্তরে রিয়ার ভাব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে এবং তুমি ইবাদত প্রকাশ করিয়া লোকের ভক্তি আকর্ষণের চেষ্টায় তৎপর রহিয়াছ ও পারলৌকিক সওয়াবের অন্বেষণে তুমি ব্যাপৃত নহ। ইবাদত প্রকাশের অপর এক ধারা এই যে, লোকে সৎকার্য সম্পাদনের পর বলিয়া বেড়ায়- 'আমি অমুক অমুক কার্য করিয়াছি।' ইহাতে প্রবৃত্তি বেশ আরাম ও আনন্দ উপভোগ করে। এইরূপ হইয়া থাকে যে, সে স্বকৃত সৎকার্য অতিরঞ্জিত করিয়া প্রকাশ করে। সুতরাং রসনা সংযত রাখিয়া এইরূপ স্থলে ইবাদত প্রকাশ না করাই অবশ্য কর্তব্য। তবে যিনি প্রশংসা ও নিন্দাকে তুল্য ভাবিয়া নির্বিকার থাকিতে পারেন, যাঁহার নিকট তৎপ্রতি লোকের অনুরাগ ও বিরাগ সমান বলিয়া মনে হয় এবং পরিশেষে যিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করিতে পারেন যে, সৎকার্য প্রকাশ করিলে দেখাদেখি সৎকার্যের প্রতি লোকের উৎসাহ বৃদ্ধি পাইবে, এইরূপ স্থলে সৎকার্য প্রকাশ করা যায়। শক্তিমান কামিল সিদ্ধপুরুষগণ জগতের মঙ্গল কামনায় বহু সৎকার্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

সৎকার্য প্রকাশের দৃষ্টান্ত—হযরত সা'দ ইব্ন মুআয রাযিআল্লাহু আনহু বলেন- "আমি ইসলাম গ্রহণের পর হইতে যত নামায পড়িয়াছি ইহাতে সর্বদা এই ধারণা অক্ষুণ্ন রাখিয়াছি যে, কিয়ামত দিবস আল্লাহ্ এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, এই উত্তর দিব- 'ইহা ভিন্ন আমি অন্য কোনই পছন্দ করি নাই এবং রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট হইতে আমি যাহা কিছু শ্রবণ করিয়াছি ইহাকে সত্য ও অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস করিয়া চলিয়াছি।" হযরত উমর রাযিআল্লাহু আনহু বলেন-

"প্রত্যুষে শয্যাত্যাগের পর আমার সম্মুখে যত সহজ বা কঠিন কার্য উপস্থিত হয়, তন্মধ্যে কোনটিতে মঙ্গল নিহিত রহিয়াছে তাহা আমি বুঝিতে পারি।" হযরত ইব্ন মাসউদ রাযিআল্লাহু আনহু বলেন- "আমি প্রভাতে যে অবস্থায় জাগ্রত হই, তাহার কোন পরিবর্তন হউক, ইহা আমি চাই না।' হযরত ওসমান রাযিআল্লাহু আনহু বলেন- "আমি রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মুবারক হস্তে হস্ত রাখিয়া ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর হইতে কখনও ডান হাতে গুপ্তাঙ্গ স্পর্শ করি নাই, কখনও গান করি নাই এবং কখনও মিথ্যা বলি নাই।" হযরত আবূ সুফিয়ান রাযিআল্লাহু আনহু মৃত্যু সময়ে বলেন- "আমার জন্য রোদন করিও না। ইসলাম গ্রহণের পর হইতে আমি কোন পাপ করি নাই।" হযরত উমর ইব্ন আব্দুর আযীয (র) বলেন- "আল্লাহ্‌র মঙ্গলময় বিধানে যে কোন বিপদেই আমি নিপতিত হইয়াছি, ইহাতে আমি ধৈর্য ধারণ করিয়াছি। আর অদৃষ্টলিপিতে আল্লাহ্ যাহা আমার জন্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, ইহাতে আমি পরিতৃপ্ত ও সন্তুষ্ট রহিয়াছি।" এই সকল উক্তি অসীম শক্তিশালী মহামনীষীগণের পক্ষেই সম্পবপর; যেমন-তেমন লোকের পক্ষে তদ্রূপ উক্তি শোভা পায় না।

মন্দের মধ্যে মঙ্গল—প্রিয় পাঠক, অবগত হও, পরম কৌশলী আল্লাহ্ নিখিল বিশ্বে প্রত্যেক বস্তু এমন কৌশলে সুবিন্যস্ত করিয়া রাখিয়াছেন যে, প্রত্যেক মন্দের ভিতরও এমন মঙ্গল নিহিত রহিয়াছে যাহা মানব বুদ্ধির অগম্য। দেখ, রিয়া যে এত বড় ক্ষতিকর কুপ্রবৃত্তি ইহাতেও অপর লোকের জন্য প্রচুর মঙ্গল নিহিত আছে, যদিও রিয়ার দরুন ইবাদতকারীর সকল সওয়াব বিনষ্ট হইয়া যায়। কারন, বহু লোক এমন আছে যাহারা রিয়ার বশবর্তী হইয়া সৎকর্ম করিয়া থাকে; কিন্তু তাহারা শুদ্ধ সংকল্প লইয়া একমাত্র আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে কার্য করিতেছে মনে করিয়া অপর লোকে তাহাদের অনুকরণ করত প্রভূত কল্যাণ লাভ করে।

একটি ঘটনা—কথিত আছে এক সময়ে বসরা শহরের প্রত্যেক অলিতে-গলিতে কুরআন পাঠ ও যিকিরের শব্দ শুনা যাইত। ইহাতে সকলের মনেই কুরআন শরীফ পাঠ ও যিকির করিবার আগ্রহ বৃদ্ধি পাইত। এক ব্যক্তি রিয়ার সুক্ষ্ম বিষয়াদি বর্ণনা করিয়া একখানা পুস্তক প্রকাশ করিলেন। এই পুস্তক প্রচারের ফলে লোকের মন হইতে প্রকাশ্য যিকির ও উচ্চস্বরে কুরআন শরীফ পাঠের ইচ্ছা লোপ পাইল এবং ইহাতে যিকির ও কুরআন পাঠের প্রতি তাহাদের আগ্রহও কমিয়া গেল। এই পরিবর্তন দেখিয়া অনেকে দুঃখ করিয়া বলিলেন- "হায়! এই পুস্তকখানা প্রকাশিত না হইলেই ভাল হইত।" রিয়ার বশীভূত হইয়া কাজ করিলে স্বীয় অনিষ্ট সাধন করা হয় বটে, কিন্তু সৎকার্য প্রদর্শনে অপরের পরিত্রাণের উপায় করিয়া দেওয়া হয়।

পাপ গোপনের বিধান—প্রিয় পাঠক, জানিয়া রাখ, ইবাদত প্রকাশ করাকে রিয়া বলে। কিন্তু সাতটি কারণে সর্বদাই পাপ গোপন করার বিধান রহিয়াছে। প্রথম-

আল্লাহ্ পাপ গোপনের আদেশ দিয়াছেন। রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন– "কাহারও দ্বারা কোন পাপকার্য সংঘটিত হইলে আল্লাহ্ যে প্রকারে ইহা ঢাকিয়া রাখেন, তদ্রূপ আবরণে ইহাকে ঢাকিয়া রাখা আবশ্যক।" দ্বিতীয়– ইহকালে পাপ গোপন রাখিলে আশা করা যায় যে, পরকালেও ইহা গোপন থাকিবে। তৃতীয়– লোকের তিরস্কার হইতে বাঁচিবার জন্য পাপ গোপন করা সঙ্গত; কেননা অপরের তিরস্কারে অন্তর পেরেশান থাকিবে, ইবাদতকার্যে বিঘ্ন ঘটিবে এবং মনের একাগ্রতা বিনষ্ট হইবে। চতুর্থ– তিরস্কার ও নিন্দায় মানুষ দুঃখিত হইয়া থাকে, ইহা তাহার প্রকৃতিগত। তিরস্কারে দুঃখিত হওয়া ও ইহা হইতে বাঁচিয়া থাকা হারাম নহে। তাওহীদ জ্ঞানের (আল্লাহ্‌র একত্র জ্ঞানের) পরম উন্নতি লাভ না করিলে প্রশংসা ও নিন্দাকে তুল্য ভাবিয়া নির্বিকার থাকা চলে না এবং সকলে চূড়ান্ত শিখরে উপনীত হইতে পারে না। নিন্দার ভয়ে ইবাদত গোপন করা জায়েয নহে; তবে একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি বিধানের নিমিত্ত বিশুদ্ধ সংকল্পে ইবাদত করা অবশ্য কর্তব্য। প্রশংসার লোভ সংবরণ করত সৎকার্য করা বরং কতকটা সহজ, কিন্তু নিন্দার বিষদংশন সহ্য করিয়া কর্তব্যে দৃঢ়পদ থাকা বড় দুষ্কর। পঞ্চম– যদি আশংকা হয় যে, পাপ প্রকাশ পাইলে লোকে কষ্ট দিবে এইরূপ স্থলে তদ্রূপ পাপের জন্য শরীয়ত মতে তাহার উপর শাস্তি প্রদান অবশ্য কর্তব্য হইলেও ইহা গোপন রাখা ও অনিষ্ট হইতে বাঁচিয়া থাকার বিধান আছে। তবে পাপাচারীকে পাপের জন্য যথারীতি তওবা করিতে হইবে। ষষ্ঠ– লোক-লজ্জার ভয়ে পাপ গোপন করা যায়। লজ্জা প্রশংসনীয় এবং ঈমানের অংশবিশেষ। আর লজ্জা ও রিয়ার মধ্যে বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান। সপ্তম– পাপকার্য প্রকাশ পাইলে অপর লোকের পাপকার্যে সাহসিকতা বৃদ্ধি পাইবে, এই ধারণার বশবর্তী হইয়া পাপাচার গোপন করাতে কোন দোষ নাই। কিন্তু পাপ গোপন করিলে লোকে পাপাচারীকে পরহেযগার বলিয়া ভক্তি করিবে, এই উদ্দেশ্যে পাপ গোপন রাখা স্পষ্ট রিয়া ও হারাম।

জগতে এমন লোকও আছেন যাঁহাদের ভিতর-বাহির সমান। তাঁহারা সিদ্দীক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। যাঁহারা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল পাপ পরিহার করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই এই উন্নত মর্যাদা লাভে সমর্থ হইয়াছেন। আবার সংসারে এইরূপ লোকও বিরল নহে, যাহারা স্বীয় পাপাচার প্রচার করিয়া বেড়ায় এবং বলে "যাহা আল্লাহ্ অবগত আছেন, তাহা লোকের অগোচরে রাখিলে কি লাভ হইবে?" নির্বোধরাই এইরূপ উক্তি করিয়া থাকে। এইরূপ কথা বলা নিষিদ্ধ, বরং নিজ ও অপরের পাপ ঢাকিয়া রাখা কর্তব্য।

রিয়ার ভয়ে সৎকার্য পরিহারের স্থান—প্রিয় পাঠক, অবগত হও, ইবাদত তিন প্রকার। প্রথম প্রকার ইবাদত সম্পূর্ণরূপে নিজস্ব, অপরের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই; যেমন নামায, রোযা ইত্যাদি। দ্বিতীয় প্রকার ইবাদতের সর্বতোভাবে লোকের

সঙ্গে সম্বন্ধ রহিয়াছে; যথা রাষ্ট্র পরিচালনা, বিচারকার্য ও শাসনকার্য। তৃতীয় প্রকার ইবাদতের প্রভাব অপর লোকের মধ্যে প্রকাশ পায় এবং নিজের সঙ্গেও ইহার সম্পর্ক থাকে; যথা– শিক্ষাদান, উপদেশ প্রদান, ওয়ায-নসীহত ইত্যাদি।

প্রথম প্রকারের ইবাদত, যেমন নামায, রোযা, হজ্জ ইত্যাদি রিয়ার ভয়ে কখনও ছাড়িয়া দেওয়া সঙ্গত নহে। যদি এইরূপ ইবাদত-কার্যের প্রারম্ভে বা মধ্যভাগে রিয়ার ভাব উপস্থিত হয় তবে ইহা দূরীকরণের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে এবং ইবাদতের সংকল্পকে সতেজ করিয়া লইতে হইবে। আর অপর লোকে দেখেতেছে বলিয়া তদ্রূপ কার্য সম্পাদনে কোন প্রকার হ্রাস বৃদ্ধি করা যাইবে না। কিন্তু যে-স্থলে ইবাদতের নিয়তই থাকে না, কেবল রিয়ার উদ্দেশ্যে ইবাদত করা হয়, এমন ইবাদতকে ইবাদতের মধ্যে গণ্য করা হয় না। তবে, যতক্ষণ মূল নিয়ত বিনষ্ট না হয় ততক্ষণ ইবাদত ছাড়িয়া দেওয়া সঙ্গত নহে। হযরত ফুযাইল রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন– " লোকে দেখিতেছে বলিয়া ইবাদত কার্য ছাড়িয়া দেওয়া রিয়া এবং মানুষকে দেখাইবার উদ্দেশ্যে যে ইবাদত করা হয়, ইহা ইবাদতে পরিগণিত হয় না, বরং ইহা শিরিকের অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে।"

প্রিয় পাঠক, জানিয়া রাখ, শয়তান তোমাকে ইবাদত করিতে দিতে চায় না। কিন্তু তোমাকে বিরত রাখিতে অসমর্থ হইলে সে অন্য প্রকার প্ররোচনা দিয়া বলে– "লোকে তোমার ইবাদত দেখিতেছে; সুতরাং ইহা রিয়া, ইবাদত নহে।" শয়তান এইরূপে ধোঁকা দিয়া তোমাকে ইবাদত হইতে বিরত রাখিতে চেষ্টা করে। তুমি যদি এই ধোঁকায় পড়িয়া লোকালয় পরিত্যাগপূর্বক ভূগর্ভেও প্রবেশ কর তথাপি শয়তান তোমাকে বলিবে– "লোকে জানিতে পারিয়াছে যে, তুমি লোকালয় হইতে পালাইয়া আসিয়া সংসারবিরাগী পরহেযগার সাজিয়াছ। ইহা বৈরাগ্য ও পরহেযগারী নহে, বরং ইহাও রিয়া।" অতএব তুমি তৎপ্রতি কর্ণপাত না করিয়া শয়তানকে এই উত্তর দিয়া নিরস্ত করিবে– "অপরের মনস্তুষ্টি বিধানে ব্যাপৃত থাকা ও লোকে দেখিবে বলিয়া ইবাদত ছাড়িয়া দেওয়া রিয়া। পরের দেখা, না দেখা আমার নিকট সমান। আমার অভ্যাস অনুযায়ী আমি কাজ করিয়া যাইতেছি এবং আমি কল্পনাও করি না যে, অপর লোকে ইহা দেখিতেছে।"

লোকে দেখিবে বলিয়া ইবাদত ছাড়িয়া দেওয়া কেমন, ইহা বুঝাইবার জন্য একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাইতেছে। মনে কর, ঝাড়িয়া বাছিয়া পরিষ্কার করিবার জন্য প্রভু স্বীয় ভৃত্যকে কিছু গম দিল। কিন্তু ভৃত্য ইহা পরিষ্কার না করিয়াই বলিল– "শত চেষ্টা করিলেও ইহা একেবারে নির্মল করা যাইবে না; কাজেই ইহার চেষ্টা করি নাই।" এমতাবস্থায়, প্রভু বিরক্ত হইয়া তাহাকে বলিবে– "রে নির্বোধ! তুই ত মূলত কাজটিই করিস নাই। তোর এইরূপ আচরণে গমগুলি ত আর নির্মল হইল না।" বিশুদ্ধ সংকল্পে ইবাদত করিবার জন্য আল্লাহ্ আদেশ করিয়াছেন। তুমি সংকল্প বিশুদ্ধ

করিতে পারিলে না বলিয়া যদি ইবাদত ছাড়িয়া দাও, তবে বিশুদ্ধ সংকল্প কোথায় পাওয়া যাইবে? কারণ, সৎকার্য সম্পাদনের মধ্যেই বিশুদ্ধ সংকল্প থাকে। কথিত আছে যে, হযরত ইবরাহীম নখ্য়ী রাহ্মাতুল্লাহি আলায়হি কুরআন শরীফ পাঠকালে কেহ তাঁহার নিকট আগমন করিলে তিনি পাঠ বন্ধ করিয়া দিতেন এবং তিনি যে সর্বদা কুরআন শরীফ পাঠ করেন, ইহা লোককে জানিতে দিতে পছন্দ করিতেন না। ইহা হইতে এই ধারণা করা সঙ্গত নহে যে, লোকে দেখিবে বলিয়া তিনি কুরআন পাঠ বন্ধ করিয়া দিতেন; বরং তিনি জানিতেন যে, কোন আগন্তুক আসিলে পাঠ বন্ধ করিয়া তাহার সহিত কথা বলা উচিত। আর ইহাও হইতে পারে যে, তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালে কুরআন পাঠকেই অধিক মঙ্গলজনক বলিয়া মনে করিয়া থাকিবেন। হযরত হাসান বসরী (রা) এক ব্যক্তি প্রসঙ্গে বলেন যে, তাঁহার রোদন আসিলে তিনি স্বীয় মুখ ঢাকিয়া লইতেন, যাহাতে লোকে তাঁহার রোদন সম্পর্কে অবগত না হইতে পারে। কারণ, আল্লাহ্র ভয়ে প্রকাশ্য রোদন অপেক্ষা গোপন রোদন উত্তম। ঐ ব্যক্তি প্রকাশ্য রোদন হইতে বিরত রহিলেন; আর রোদন প্রকাশ করা কোন ইবাদত নহে। হযরত হাসান বস্রী (র) আরও বলেন– এক ব্যক্তি রাস্তার উপর হইতে লোকের কষ্টদায়ক দ্রব্যাদি সরাইয়া দিতে চাহিত। কিন্তু লোকে তাহাকে পরহেযগার বলিয়া মনে করিবে, এই আশঙ্কায় সে উহা করিত না। ইহা কোন দুর্বলচিত্ত লোকের ঘটনা হইবে। সে হয়ত মনে করিয়াছে যে, লোকে তাহার পরহেযগারী জানিতে পারিলে অন্যান্য ইবাদতে সে স্বাদ পাইবে না। কিন্তু রিয়ার ভয়ে তদ্রূপ কার্য হইতে বিরত থাকা তাহার পক্ষে ভাল হয় নাই, বরং রাস্তার কষ্টদায়ক দ্রব্যাদি দূরীকরণ এবং তৎসঙ্গে রিয়ার ভাব দূর করিবার চেষ্টা করা তাহার পক্ষে উচিত ছিল। দুর্বলচিত্ত লোকেরাই ঐরূপ সৎকার্য পরিত্যাগ করত নিজের মঙ্গল কামনা করে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইহা তাহাদের জন্য অনিষ্টকরই হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় প্রকারের ইবাদত শাসন কার্য, বিচার কার্য ও রাষ্ট্র পরিচালনা অপর লোকের সহিত সম্বন্ধ রাখে। ন্যায়বিচারের সহিত সুক্ষ্মভাবে সম্পন্ন করিতে পারিলে এই সকল শ্রেষ্ঠ ইবাদতের মধ্যে গণ্য। কিন্তু উহাতে পক্ষাপতিত্ব ও অবিচার করিলে মহাপাপী হইতে হয়। যে ব্যক্তি সুবিচার করিবে বলিয়া নিশ্চিত ও নিশ্চিন্ত হইতে পারে নাই, তাহার পক্ষে এইরূপ দায়িত্বপূর্ণ কার্য গ্রহণ করা হারাম। কারণ, উহা ভীষণ বিপদসমূহে পরিপূর্ণ। নামায, রোযা ইত্যাদি ইবাদত কিন্তু এইরূপ নহে। কারণ, নিছক নামায রোযাতে কোন আনন্দ নাই। অবশ্য উহা প্রকাশ পাইলে আনন্দ হইয়া থাকে; কিন্তু রাজশক্তি পরিচালনা কার্যে আনন্দ অপরিসীম এবং ইহা বিষম প্রলোভনের আকর। যে ব্যক্তি সুবিচার করিতে সক্ষম হইবে বলিয়া নিজের উপর সম্পূর্ণরূপে ভরসা করিতে পারে, তাহার পক্ষেই তদ্রূপ কার্য শোভা পায়। যে ব্যক্তি বিশেষ পরীক্ষার পর নিজের অপক্ষপাতিত্ব ও ন্যায়বিচার শক্তির উপর নির্ভর করিতে

পারিয়াছে এবং রাজক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইবার পূর্বেই আমানতদারীর পরিচয় দিতে সক্ষম হইয়াছে, এমন ব্যক্তির অন্তরেও যদি বিচারকের পদ প্রাপ্তির পর তাহার স্বভাব পরিবর্তন হইয়া যাওয়ার আশঙ্কা থাকে এবং পদচ্যুতির ভয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে খোশামোদ করিবে বলিয়া মনে হয়, তবে এইরূপ ব্যক্তির পক্ষে উক্ত পদ গ্রহণ করা উচিত কিনা, তৎসম্বন্ধে বিজ্ঞ আলিমগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। কতক আলিম রাজপথ গ্রহণের পক্ষে অভিমত প্রদান করিয়া বলেন যে, যখন নিজকে পূর্বেই পরীক্ষা করা হইয়াছে তখন সে সন্দেহকে অমূলক সন্দেহই মনে করিয়া নিজের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত। কিন্তু আমাদের মতে তদ্রূপস্থলে পদ গ্রহণ না করাই সঙ্গত। পূর্ব পরীক্ষাকালে প্রবৃত্তি ন্যায়বিচারের অঙ্গীকার করিয়া থাকিলেও ইহা হয়ত প্রতারণামূলক হইতে পারে এবং পদ লাভের পর স্বভাব পরিবর্তন হইয়া যাইতে পারে। প্রথমেই মনে সংশয় দেখা দিলে পরে স্বভাব পরিবর্তনের প্রবল সম্ভাবনা থাকে। এমতাবস্থায়, রাজপদ গ্রহণে বিরত থাকাই উত্তম। অপরিসীম মানসিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কাহারও পক্ষে শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করা উচিত নহে।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রাযিআল্লাহু আন্হু হযরত রাফে' রাযিআল্লাহু আন্হুকে লক্ষ্য করিয়া বলেন– "তুমি কখনও শাসনকার্যের ভার গ্রহণ করিও না, যদিও তুমি দুই ব্যক্তির শাসনকর্তাই হও না কেন।" তৎপর তিনি খলীফা পদে অভিষিক্ত হইলে হযরত রাফে' (রা) তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন– "আপনি তো আমাকে শাসনভার গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন; কিন্তু আপনি খলীফার পদ গ্রহণ করিলেন।" হযরত আবূ বকর (রা) উত্তরে বলিলেন– "আমি এখনও তোমাকে নিষেধ করিতেছি। যে ব্যক্তি ন্যায়বিচার করে না, তাহার উপর আল্লাহ্র অভিসম্পাত।" এইরূপ দুর্বল প্রতিবাদের মীমাংসার জন্য এই দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। মন কর, এক সন্তরণপটু ব্যক্তি নদীর গভীর পানিতে অবতরণ করে; অথচ সে তাহার পুত্রকে নদীর তীরে আসিতেও নিষেধ করে। কারণ, পুত্র সন্তরণ জানে না বলিয়া নদীতে পড়িলে ডুবিয়া মরিবে। বাদশাহ যদি অত্যাচারী হয় এবং বিচারক ন্যায়বিচার করিতে না পারে ও পদরক্ষার্থ কর্তৃপক্ষকে খোশামোদ করিতে হয়, এমতাবস্থায়, বিচারক ও শাসনকর্তার পদ গ্রহণ করা উচিত নহে। আবার কোন পদ গ্রহণ করিলেও পদচ্যুতির ভয়ে কাহাকেও খোশামোদ করা সঙ্গত নহে। বরং তদ্রূপ স্থানেও ন্যায়পরায়ণতার সহিত সুবিচার করা উচিত। আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ন্যায়বিচার করিতে গেলে যদি পদচ্যুত হইতে হয়, তবে ইহাতে আনন্দ হওয়া আবশ্যক।

তৃতীয় প্রকারের ইবাদত, ওয়ায করা ও ফতওয়া (ধর্ম-ব্যবস্থা) প্রদান, শিক্ষাদান এবং হাদীস বর্ণনাও ইহার অন্তর্ভুক্ত। এই সমুদয় কার্য অত্যন্ত আনন্দদায়ক, উহাতে নামায-রোযা অপেক্ষাও অধিক রিয়ার প্রবেশাধিকার রহিয়াছে। এই শ্রেণীর কাজ শাসনকার্যের প্রায় সমতুল্য। প্রভেদ মাত্র এতটুকু যে, বক্তৃতা ও উপদেশ প্রদান

শ্রোতৃবর্গ ও বক্তা উভয় পক্ষেরই উপকার হইয়া থাকে। ওয়ায-নসীহত দ্বারা লোককে ধর্মের দিকে আহবান করা হয় এবং ইহা রিয়া হইতেও তাহাদিগকে অব্যাহতি দেয়। রাষ্ট্র পরিচালনার কার্যে এই বিশেষত্ব নাই। তবে বক্তার মনে রিয়ার ভাব উদয় হইলে ওয়ায-নসীহত পরিত্যাগ করা উচিত কিনা, এই সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কতক আলিম এইরূপ স্থলে ওয়ায-নসীহত করা হইতে বিরত থাকেন। সাহাবা রাযিআল্লাহু আন্হুমের নিকট কেহ কোন ফতওয়া জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা অপরের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে বলিতেন। হযরত বিশরে হাফী (র) হাদীসের বহু কিতাব ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া বলিলেন– "মুহাদ্দিস (হাদীস বর্ণনাকারী) হওয়ার বাসনা আমার অন্তরে জাগিয়া উঠিল। তাহা না হইলে আমি হাদীস বর্ণনা করিতাম।" বুযুর্গগণের উক্তি এই যে, হাদীস বর্ণনা করাও দুনিয়ার একটি কাজ। আর যে ব্যক্তি হাদীস বর্ণনা করে সে যেন বলে– "হে মানব, আমাকে সভাপতির আসনে বরণ করিয়া লও এবং আমাকে উচ্চ আসনে বসাও।" এক ব্যক্তি হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্হুর নিকট লোককে উপদেশ দানের অনুমতি চাহিল। তিনি বলিলেন- "(তুমি উপদেশ প্রদানে রত হইলে) আমার আশঙ্কা হয় যে, তোমার পেটে এত বাতাস প্রবেশ করিবে যে, তোমাকে উড়াইয়া আকাশে তুলিবে।" অর্থাৎ ইহাতে গর্বিত হইয়া যাওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে। হযরত ইবরাহীম তাইমী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন— "যখন তোমাদের কথা বলার অভিলাষ দেখিতে পাও তখন চুপ থাক; আর চুপ থাকিবার অভিলাষ হইলে কথা বল।"

কিন্তু ওয়ায-নসীহত করার প্রশ্নে আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, ওয়ায-নসীহতকারী বা হাদীস বর্ণনাকারীকে স্বীয় অন্তর পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। যদি দেখা যায় যে, এই শ্রেণীর ইবাদতকার্যে রিয়ার ভাবও বিদ্যমান রহিয়াছে, তবুও ইহা হইতে বিরত না থাকিয়া ওয়ায-নসীহত করিয়া যাওয়া আবশ্যক। তবে, তৎসঙ্গে ইবাদতের সেই উদ্দেশ্যকে ক্রমশ সবল করিয়া লওয়ার চেষ্টা করিতে হইবে।

ওয়ায-নসীহতের আদেশকে সুন্নত ও নফলতুল্য গণ্য করিবে। উহাতে ইবাদতের মূল সংকল্প পরিলক্ষিত হইলে রিয়ার আশংকায় উহা পরিত্যাগ করা উচিত নহে; শাসনকার্যের ব্যাপারে এই কথা খাটে না। কারণ, অদ্রূপ কার্যে ইবাদতের সংকল্প নষ্ট হইয় অতি তাড়াতাড়ি অসাধু অভিলাষ মানব-অন্তরে প্রবল হইয়া উঠে। এই কারণেই হযরত ইমাম আবূ হানীফা রাহ্মাতুল্লাহি আলায়হি বিচারকের পদ গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু তিনি শিক্ষাদানকার্য পরিত্যাগ করেন নাই। অপরপক্ষে, যদি বুঝা যায় যে, ইবাদতের সংকল্প মোটেই নাই এবং অন্তর একমাত্র রিয়ার ভাবেই পরিপূর্ণ রহিয়াছে, তবে এইরূপ স্থলে ওয়াস-নসীহত পরিত্যাগ করাই অবশ্য কর্তব্য।

এই বিষয়ে যদি কেহ আমাদের পরামর্শ চাহে এবং আমরা বিলক্ষণ বুঝিতে পারি যে, ইহাতে কোন মঙ্গল হইবে না, অর্থাৎ তাহারা বক্তৃতা যদি নিরর্থক উক্ত ও

হাস্যরসিকতায় ভরপুর হয়, সে যদি আল্লাহ্র রহমতের অলীক প্রতিশ্রুতি শুনাইয়া পাপের প্রতি লোকের সাহসিকতা বাড়াইয়া তুলে বা ঝগড়া ও বাদ-প্রতিবাদে লোককে উদ্বুদ্ধ করে এবং উহাতে মানব হৃদয়ে গর্ব ও অহংকারের বীজ অঙ্কুরিত হয়, তবে এমন ব্যক্তিকে আমরা ওয়ায-নসীহত করিতে নিষেধ করিব। তদ্রূপস্থলে ওয়াস-নসীহত করিতে না দিলেই তেমন ব্যক্তির উপকার করা হইয়া থাকে। কিন্তু বক্তার কথা যদি শরীয়ত অনুযায়ী হয়, লোকে যদি তাহাকে খাঁটি বলিয়া মনে করে এবং তাহার উপদেশ লোকের ধর্ম জ্ঞানের পক্ষে মঙ্গলজনক বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তবে তেমন বক্তাকে ওয়ায-নসীহত হইতে বিতর থাকিবার অনুমতি আমরা দিব না। কারণ, এইরূপ ব্যক্তিকে উপদেশ প্রদানে নিষেধ করিলে বহু লোকের ক্ষতি হয়; আর তদ্রূপ স্থলে রিয়ার বশীভূত হইয়া উপদেশ প্রদান করিলে শুধু উপদেষ্টারই ক্ষতি হইয়া থাকে। আবার একজনের পরিত্রাণের প্রতি লক্ষ্য রাখা অপেক্ষা বহু লোকের পরিত্রাণের প্রতি লক্ষ্য রাখাকে অধিক গুরত্ব দেওয়া উচিত। অতএব বহু লোকের মঙ্গল কামনায় তদ্রূপ ব্যক্তিকে আমরা উৎসর্গ করিয়া দিতে পারে। রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "আল্লাহ্ (ইসলাম) ধর্মের সাহায্য এমন লোকের দ্বারা করাইবেন যাহাদের মধ্যে ধর্মভাব বিন্দুমাত্র নাই।" রিয়ার বশবর্তী হইয়া যাহারা সদুপদেশপূর্ণ ওয়ায-নসীহত করে, এই হাদীসে তাহাদিগকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। আমরা তদ্রূপ ইহা ব্যতীত আর কিছুই বলিব না- "তুমি অপরকে যে উপদেশ দান কর, অগ্রে তুমি ইহা প্রতিপালন কর; সর্বাগ্রে তুমি আল্লাহ্কে ভয় কর এবং তৎপর অপরকে ভয়ের কথা শুনাও।"

বক্তার উদ্দেশ্য বিচার—কেহ যদি জিজ্ঞাসা করে যে, বক্তার নিয়ম যে বিশুদ্ধ ও সঠিক ইহার নিদর্শন কি? তবে আমাদের উত্তর এই ঃ **প্রথম**—মানব জাতির প্রতি মমতাবোধে এবং তাহাদিগকে আল্লাহ্র পথে পরিচালিত করিবার উদ্দেশ্যে যদি বক্তা উপদেশ দান করে, তবে বুঝা যাইবে যে, তাহার নিয়ত বিশুদ্ধ ও সঠিক। কিন্তু অপর বক্তাকে দেখিয়া যদি তাহার মনে হিংসার উদ্রেক হয় তবে বুঝিবে তাহার নিয়ত বিশুদ্ধ নহে; জনগণের মন আকর্ষণ করাই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য। **দ্বিতীয়**—সভাস্থলে যদি কোন দুনিয়াদার লোক বা উচ্চ রাজকর্মচারী আগমন করে এবং বক্তা বক্তৃতার ভাব ও বিষয় পরিবর্তন না করিয়া অভ্যাস অনুযায়ী উপদেশ প্রদান করিয়া চলে, তবে তাহার নিয়তের বিশুদ্ধতা বুঝা যাইবে। নিয়তের বিশুদ্ধতা বুঝিবার **তৃতীয় নিদর্শন এই**— বক্তার মুখে শরীয়ত-বহির্ভূত কথা শুনিয়া শ্রোতৃবৃন্দ রোদন বা কোন প্রকার উচ্চ ধ্বনি করে, শরীয়ত-বহির্ভূত হওয়ার দরুন কোন কথা আসিয়া পড়ে এবং তৎপ্রতি বক্তারা হৃদয়ে ঘৃণার উদ্ভব না হয় তবে বুঝিবে যে, রিয়ার বশবর্তী হইয়া সে বক্তৃতায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। আর যদি ঘৃণার উদ্রেক হয় তবে বুঝা যাইবে যে, রিয়া ভিন্ন তাহার অন্য সদুদ্দেশ্যও আছে। তেমন স্থলে এই সঠিক নিয়তকে প্রবল করিয়া তোলার চেষ্টায় তৎপর হওয়া উচিত।

স্থানবিশেষে ইবাদত প্রকাশে রিয়া না হওয়ার কারণ—কোন কোন সময় ইবাদত করিতে অপর লোকে দেখিলে মনে যে আনন্দ হয়, ইহা নাজায়েয ও রিয়া নহে। কারণ, ইবাদত সর্বদাই মুসলমানের হৃদয়গ্রাহী বস্তু। কোন কোন বিষয়ে ইহাতে বিঘ্ন ঘটিলে লোকের সম্মুখীন হওয়ার কারণে যদি এই বাধা-বিঘ্ন বিদূরিত হয়, তবে আনন্দ প্রকাশ পাওয়াই স্বাভাবিক। উহাদরণস্বরূপ মনে কর, কোন এক ব্যক্তির পক্ষে স্বীয় গৃহে তাহাজ্জুদ নামায পড়া দুষ্কর। কারণ, তথায় সে স্বীয় স্ত্রীর সহিত কথাবার্তায় ব্যাপৃত থাকে; কিন্তু অপরের বাড়ীতে গেলে সেইরূপ বাধা-বিঘ্ন থাকে না এবং তজ্জন্য ইবাদতের সুযোগ পাইয়া মন প্রফুল্ল হইয়া উঠে। অপর লোককে ইবাদতে লিপ্ত দেখিয়া তাহার মনে তৎপ্রতি উৎসাহ পাইয়া থাকে এবং নিজকে পূণ্যের ভিখারী ভাবিয়া তাহাদের সহিত ইবাদতে প্রবৃত্ত হয়। যে স্থানে সকলেই রোযা রাখে বা আহার্য সামগ্রীর অভাব, এইরূপ স্থানে গমন করিলে তাহার হৃদয়ে রোযা রাখিবার বাসনা প্রবল হয়। স্বীয় গৃহে তারাবীহ্‌র নামায পড়িতে আলস্য আসে; কিন্তু অপর লোককে মসজিদে নামায পড়িতে দেখিয়া তাহার সেই আলস্য বিদূরিত হয়। অথবা জুমআর দিনে অপর লোককে আল্লাহ্‌র যিকিরে অধিক লিপ্ত দেখিয়া সেও তদ্রূপ নামায ও তস্‌বীহ্‌ পড়িতে থাকে। এবংবিধ স্থানসমূহে রিয়া না হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। অথচ শয়তান বলে- ইবাদতে উৎসাহ মানুষের দৃষ্টির কারণেই হইয়াছে, অতএব উহা রিয়া।

ইবাদত প্রকাশে আনন্দ রিয়া কিনা বুঝিবার উপায়—লোক-সমক্ষে ইবাদতে উৎসাহ বর্ধন ও ইহার বাধা-বিঘ্ন অপসারণের নিমিত্ত যে স্থলে সৎকার্যে আনন্দ জন্মে না, বরং লোকে দেখিতেছে বলিয়াই আনন্দ হয়, তদ্রূপ স্থলে কিন্তু শয়তান বলিতে থাকে- "এই ইবাদত করিতে থাক। ইহার বাসনা তোমার হৃদয়ে পূর্ব হইতেই আছে। কিন্তু ইহাতে যে বাধা-বিঘ্ন ছিল, তাহা এখন বিদূরিত হইল।" এমতাবস্থায়, উপরি উক্তি দ্বিবিধ কারণের কোন্‌টির দরুন হৃদয়ে আনন্দের সঞ্চার হয়, গভীর মনোনিবেশ সহকারে ইহা বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক। মনে কর, তুমি অন্য লোককে ইবাদত করিতে দেখিতেছ, কিন্তু তাহারা তোমার ইবাদতের দিকে লক্ষ্য করিতেছে না, তবুও তুমি আনন্দানুভব করিলে মনে করিবে পূণ্য-প্রাপ্তির বাসনাই তোমার ইবাদতের কারণ। আর তাহারা দেখিতেছে না বলিয়া যদি তোমার পূর্ববৎ আনন্দ না থাকে, তবে বুঝিবে ইহা রিয়া। এইরূপ স্থলে, রিয়া হইতে মুক্তি লাভের চেষ্টা করিবে। আবার যে ইবাদতে প্রশংসা-লিপ্‌সা ও মঙ্গল-কামনা উভয়ই নিহিত থাকে তথায় দেখিবে ইহাদের মধ্যে কোন্‌টি প্রবল। যাহাকে প্রবল পাইবে তাহাকেই তোমার ইবাদতের কারণ বলিয়া মনে করিবে।

কোন কোন সময় কুরআন শরীফ শ্রবণ করিয়া কাহাকেও রোদন করিতে দেখিলে দর্শনকারীকেও রোদন করিতে দেখা যায়; কিন্তু একাকী থাকিলে সে রোদন করিত না। এমতাবস্থায়, অপরের রোদন দেখিয়া রোদন করা রিয়া নহে। কারণ, অপরের

শোকাতুর দেখিয়া নিজের অবস্থা স্মরণ হইয়া গেলে সেও তখন কাঁদিতে আরম্ভ করে। আবার অনেক সময় হৃদয়ে কোমলতার দরুনই ক্রন্দন আসে। তবে উচ্চৈস্বরে চিৎকার করিয়া রোদন করা রিয়ার কারণেই হইয়া থাকে। অপরকে শোনানোই চিৎকার করিয়া রোদনের উদ্দেশ্য। কোন সময় আবার শোকাতুর অবস্থায় কাহাকেও ভূতলশায়ী হইয়া যাইতে দেখা যায়। এমতাবস্থায়, পাছে লোকে তদ্রূপ শোকাভিভূত হওয়াকে অমূলক বলিয়া মনে করিবে, এই আশঙ্কায় যদি সে তৎক্ষণাৎ উঠিবার শক্তি লাভ করা সত্ত্বেও ভূতলে পড়িয়া থাকে, তবে তেমন ব্যক্তি প্রথমে রিয়াকার ছিল না; কিন্তু পরে রিয়াকার হইয়া গেল। কোন ব্যক্তি হয়ত ভাবোন্মত্ততায় নাচিতে থাকে। তৎপর ইহা তিরোহিত হওয়ার পর স্বাভাবিক গতিতে চলিবার শক্তি লাভ করিয়াও অপরের উপর হেলান দিয়া আস্তে আস্তে চলা রিয়া। লোকে যেন না বলিতে পারে যে, তাহার ভাবাবেগ ক্ষণিকেই চলিয়া গেল, এই উদ্দেশ্যে তদ্রূপ করা হইয়া থাকে। অপর লোককে ইবাদতে লিপ্ত দেখিয়া স্বীয় দোষ-ত্রুটি স্মরণ হইলে বা অন্য কোন কারণে স্বীয় পাপ মনে পড়িলে আউযুবিল্লাহ ও ইস্তিগফার পড়া অবৈধ নহে। কিন্তু রিয়ার বশীভূত হইয়াও কেহ কেহ তদ্রূপ বাক্য উচ্চারণ করিয়া থাকে।

অতএব, রিয়ার আপদ হইতে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য সর্বদা সতর্ক থাকা আবশ্যক। রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "রিয়ার সত্তরটি দ্বার আছে।"

রিয়ার ভাব উদয়কালীন কর্তব্য—রিয়ার ভাব উদয় হইলে মনে মনে বিবেচনা করা উচিত যে, রিয়াকারের অন্তরের কলুষতা সম্বন্ধে আল্লাহ্‌ অবগত আছেন এবং যতক্ষণ যে রিয়ার ভাব বিদূরিত না করে, ততক্ষণ সে আল্লাহ্‌র ক্রোধে নিপতিত থাকে। রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন-

نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ خُشُوْعِ النِّفَاقِ

"আমরা কপট বিনয় হইতে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করি।" অর্থাৎ শারীরিক আকৃতিতে বিনয় প্রকাশ করা এবং অন্তরে বিনয়ভাব না থাকা কপটতার অন্তর্ভুক্ত।

রিয়াশূণ্য ইবাদতের নিদর্শন—প্রিয় পাঠক, ইতঃপূর্বে যাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহা হইতে বুঝিতে পারিয়াছ যে, নামায-রোযা ইত্যাদি যাবতীয় ইবাদত কার্যে নিয়ত বিশুদ্ধ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। কাহারও কোন অভাব মোচন করিতে চাহিলে সর্বপ্রথমে নিয়ম ঠিক করিয়া লইবে। উপকৃত ব্যক্তির নিকট হইতে বিনয় ব্যবহার কামনা করে তবে যেন শিক্ষাদানের বিনিময় চাওয়া হইল। সুতরাং এইরূপ স্থলে শিক্ষক কোন সওয়াব পাইবে না। কিন্তু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া উস্তাদের খেদমত করাই শাগরিদের পক্ষে উত্তম ব্যবস্থা। তবে উস্তাদের পক্ষে শাগরিদের খেদমত গ্রহণ না করা উচিত। কিন্তু তদ্রূপ খেদমত গ্রহণ করিলেও শিক্ষাদানের সওয়াব বিনষ্ট হইবে না। শিক্ষার্থী যদি শিক্ষকের খেদমত করিতে অস্বীকার করে, ইহাতে তাহার বিস্ময় প্রকাশ করা উচিত নহে। হুঁশিয়ার ব্যক্তিগণ এইরূপ কার্য হইতে বিরত রহিয়াছেন।

একদা এক বুযুর্গ কূপে পতিত হইলেন। তাঁহাকে উত্তোলনের জন্য লোকে রশি আনয়ন করিল। কিন্তু তিনি শপথ দিয়া বলিলেন- "যে ব্যক্তি আমার নিকট হাদীস ও কুরআন শরীফ পাঠ করিয়াছে, সে যেন এই রশি স্পর্শও না করে।" তিনি ভয় করিয়াছিলেন যে, শিক্ষার্থীদের নিকট হইতে সাহায্য গ্রহণ করিলে শিক্ষাদানের পূণ্য নষ্ট হইয়া যাইবে। এক ব্যক্তি হযরত সুফিয়ান সাওরী রাহমাতুল্লাহি আলায়হির নিকট উপঢৌকন লইয়া আগমন করিল; কিন্তু তিনি ইহা গ্রহণ করিলেন না। তখন সেই ব্যক্তি নিবেদন করিল- "আমি কখনও আপনার নিকট হাদীস পড়ি নাই।" তিনি বলিলেন- " তোমার ভাইতো পড়িয়াছে। এই উপঢৌকন গ্রহণ করিলে তোমার ভ্রাতা প্রতি অন্যান্য শিক্ষার্থী অপেক্ষা আমি অধিক সদয় হইয়া পড়ি কিনা, আমার এই আশংকা আছে।" এক ব্যক্তি দুই থলিয়াপূর্ণ স্বর্ণমুদ্রাসহ হযরত সুফিয়ান সাওরীর (র) নিকট উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল- "আপনি ভালরূপে অবগত আছেন যে, আমার পিতা আপনার বন্ধু ছিলেন এব তিনি হালাল উপার্জনে জীবিকা নির্বাহ করিতেন। আমি উত্তরাধিকারসূত্রে যাহা পাইয়াছি তাহাও সম্পূর্ণরূপে হালাল। অনুগ্রহপূর্বক এই দুই থলিয়াপূর্ণ স্বর্ণমুদ্রা উপঢৌকনস্বরূপ গ্রহণ করুন।" তিনি উহা গ্রহণ করিলেন এবং লোকটি চলিয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পর হযরত সুফিয়ান সাওরীর (র) স্মরণ হইল যে, একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই ঐ ব্যক্তির পিতার সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব ছিল। তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁহার পুত্রকে ঐ দাতার অনুসরণ পাঠাইলেন এবং স্বর্ণমুদ্রাপূর্ণ থলিয়া দুইটি তাহাকে ফেরত দিয়া দিলেন। হযরত সুফিয়ান সাওরীর (র) পুত্র বলেন- "স্বর্ণমুদ্রাগুলি ফেরত নিয়া আসার পর আমার ধৈর্যাবলম্বনের ক্ষমতা রহিল না। সুতরাং, আমি পিতাকে বলিলাম- 'আপনার মন প্রস্তুরবৎ কঠিন। আপনি জানেন যে, আপনার বিরাট পরিবার রহিয়াছে এবং তাহাদের ভরণপোষণের জন্য আপনার নিকট একটি কপর্দকও নাই। এমতাবস্থায়ও আমাদের উপর আপনার দয়া হয় না।' তিনি বলিলেন- 'তুমি কি চাও যে, তোমরা পরিতৃপ্তির সহিত পানাহার ও আমোদ-স্ফূর্তি কর এবং কিয়ামত দিবসে তজ্জন্য আমি জওয়াবদিহি করি?"

বিদ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্য—শিক্ষাদান যেমন একমাত্র আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে হওয়া উচিত তদ্রূপ একমাত্র আল্লাহ্‌র প্রসন্নতা লাভের উদ্দেশ্যেই বিদ্যা শিক্ষা করা আবশ্যক। উস্তাদের নিকট ইলম ব্যতীত অন্য কিছুর প্রত্যাশী হওয়া উচিত নহে। তাঁহার খেদমত করিলে তিনি শিক্ষাদানে অধিক যত্নবান হইবেন, এই ধারণায় তাঁহার খেদমত করা রিয়া এবং স্পষ্ট পাপ। শুধু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য উস্তাদের খেদমতের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত এবং ইহাতে কোন সম্মানের প্রত্যাশা করা সঙ্গত নহে। তদ্রূপ একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের নিমিত্তই মাতা-পিতার সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টা করা উচিত। তাহাদের সম্মুখে নিজকে পুণ্যবান বলিয়া পরিচয় দিবে না। তাঁহাদের আনন্দ বর্ধনের জন্য তোমার পবিত্রতা প্রকাশ করা পাপ।

মোটের উপর কথা এই যে, পুণ্য লাভের আশায় যে কাজ করা হয় তাহা আন্তরিকতার সহিত একমাত্র আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সম্পন্ন করা আবশ্যক।

নবম অধ্যায়

অহংকার ও আত্মগর্ব

অহংকার-প্রিয় পাঠক, অবগত হও, অহংকার ও আত্মগৌরব নিতান্ত জঘন্য কুস্বভাব। উহা করিলে বাস্তবপক্ষে স্বয়ং আল্লাহ্‌র সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হয়। অহংকার ও শ্রেষ্ঠত্ব একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যই শোভা পায়। এই কারণেই পবিত্র কুরআনে উদ্ধত অহংকারী লোকের বহু নিন্দা করা হইয়াছে। যেমন আল্লাহ্ বলেন-

كَذَالِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ

"এইরূপে প্রত্যেকে অহংকারী উদ্ধত ব্যক্তির হৃদয়ে আল্লাহ্ সীলমোহর লাগাইয়া থাকেন।" (সূরা মুমিন, ৪ রুকু, ২৪ পারা)। তিনি অন্যত্র বলেন—

وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ

"আর সমুদয় ধৃষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বী বিফল মনোরথ হইল।" (সূরা ইবরাহীম, ৩ রুকু, ১৩ পারা)। তিনি আরও বলেন—

اِنِّىْ عُذْتُ بِرَبِّىْ وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لاَّ يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ

"অবশ্যই আমি প্রত্যেক এমন অহংকারী ব্যক্তি হইতে আপন প্রভু ও তোমাদের প্রভুর আশ্রয় লইয়াছি যাহারা হিসাবের দিনকে বিশ্বাস করিত না।" (সূরা মুমিন, ৩ রুকু, ২৪ পারা)।

হাদীস ও বুযুর্গদের উক্তিতে অহংকারের জঘন্যতা—রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "কাহারও অন্তরে রাই কণিকাতুল্য অহংকার থাকিলেও সে বেহেশ্‌তে যাইবে না।" তিনি আরও বলেন- "কোন কোন লোক সর্বদা অহংকার করিয়া বেড়ায়। সমুদয় অহংকারী ব্যক্তির শাস্তি তাহার নামে লিপিবদ্ধ হইবে।" হাদীস শরীফে উক্ত হইয়াছে, একদা হযরত সুলায়মান আলায়হিস সালাম জ্বিন, পক্ষী ও মানবকে ভ্রমণে বাহির হইবার আদেশ দিলেন। কথিত আছে যে, দুই লক্ষ মানব ও দুই লক্ষ জিন তাহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তিনি তাহাদিগকে আকাশে লইয়া গেলেন। তাঁহারা এত ঊর্ধ্বে উঠিলেন যে, ফেরেশ্‌তা কর্তৃক আল্লাহ্‌র প্রশংসা কীর্তনের শব্দ শুনিতে পাইলেন। তৎপর তিনি ভূতলে অবতরণ করিলেন; এমনকি সমুদ্রতল পর্যন্ত গমন করিলেন। সেই সময় তিনি এক আকাশ বাণী শুনিতে পাইলেন

যে, "সুলায়মান আলায়হিস সালামের অন্তরে যদি কণামাত্র অহংকার থাকিতে তবে আকাশে লইয়া যাইবার পূর্বেই তাহাকে এই পাতালপুরীতে ডুবাইয়া দেওয়া হইত।" রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "কিয়ামত দিবসে অহংকারী লোক পিপীলিকার আকার ধারণ করিবে এবং আল্লাহ্‌র সম্মুখে অনুতাপ ও অনুশোচনার কারণে তাহারা অপরাপর লোকর পদতলে নিপতিত থাকিবে।" তিনি অন্যত্র বলেন- "দোযখে 'হবহব' নামক একটি গর্ত আছে। অহংকারী ও উদ্ধত লোক ইহাতে নিক্ষিপ্ত হইবে।"

হযরত সুলায়মান আলায়হিস সালাম বলেন- "অহংকারের দরুন ইবাদতও ফলপ্রদ হয় না।" রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "যে ব্যক্তি অহংকার ও গর্বভরে পোশাক পরিধান করত পৃথিবীতে বিচরণ করে, মহাপ্রভু আল্লাহ্‌ তৎপ্রতি দৃষ্টিপাতও করেন না।" তিনি আরও বলেন- "এক ব্যক্তি উত্তম পোশাক পরিধান করত অঙ্গসৌষ্ঠবে গর্বভরে বিচরণ করিতেছিল এবং নিজের (অঙ্গ-সৌষ্ঠবের) প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছিল। আল্লাহ্‌ তাহাকে ভূগর্ভে নিমজ্জিত করিয়া দিলেন। অদ্যাবধি সে সেই অবস্থায় নিমজ্জিত হইতেছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত নিমজ্জিত হইতে থাকিবে।" তিনি অন্যত্র বলেন- "যে ব্যক্তি গর্বভরে পদ বিক্ষেপ করিয়া চলে এবং নিজকে বড় বলিয়া মনে করে, সে মহাপ্রভু আল্লাহ্‌কে তাহার উপর ক্রুদ্ধ দেখিতে পাইবে।" হযরত মুহাম্মদ ইব্‌নে ওয়াসে' রাহমাতুল্লাহি আলায়হি স্বীয় পুত্রকে গর্বভরে চলিতে দেখিয়া উচ্চৈস্বরে ডাকিয়া বলিলেন- "তোমার মাতাকে আমি দুইশত দেরেম মূল্যে খরিদ করিয়া লইয়াছিলাম। আর মুসলমানদের মধ্যে তোমার পিতার ন্যায় লোক যত কম হইবে ততই মঙ্গল।" হযরত মুতাররাফ রাহ্‌মাতুল্লাহি আলায়হি একদা হযরত সাহ্‌লব রাহ্‌মাতুল্লাহি আলায়হিকে গর্বভরে পদ নিক্ষেপ করিয়া চলিতে দেখিয়া বলিলেন- "হে বান্দা, আল্লাহ্‌, এইরূপ চলনকে ঘৃণা করেন।" তিনি উত্তরে বলিলেন- "অন্ততপক্ষে তুমি ত আমাকে চিন।" হযরত মুতাররাফ (র) বলিলেন- "হাঁ, তোমাকে ভালরূপে চিনি। প্রথমে তুমি এক বিন্দু অপবিত্র পানি ছিলে; সর্বশেষে ঘৃণিত মৃত শবে পরিণত হইবে। আর এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সময়ে (অর্থাৎ জীবিতকালে) তুমি মলমূত্রাদি অপবিত্র পদার্থের ভার বহন করিয়া চলিতেছ।"

হাদীসে বিনয়ের ফযীলত—রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "যে ব্যক্তি বিনয় অবলম্বন করে, মহাপ্রভু আল্লাহ্‌ তাহার মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়া দেন।" তিনি অন্যত্র বলেন- "প্রতিটি মানুষের মাথায় একটি করিয়া লাগাম লাগানো আছে এবং দুইজন ফেরেশতা ইহা ধারণ করিয়া রহিয়াছে। যে ব্যক্তি নম্রতা অবলম্বন করে ফেরেশ্‌তাদ্বয় লাগামটি ঊর্ধ্ব দিকে টানিতে থাকে এবং বলে- ইয়া আল্লাহ্‌, তাহার মর্যাদা হ্রাস কর।" তিনি আরও বলেন– "যে ব্যক্তি দুর্বল নহে, অথচ নম্রতা প্রদর্শন করে, হালাল উপায়ে অর্জিত ধন আল্লাহ্‌র পথে বিতরণ করে, অসহায় লোকের

উপর দয়া করে এবং তত্ত্বজ্ঞ ও আলিমদের সহিত মেলামেশা রাখে, সেই ব্যক্তি পূণ্যবান।" হযরত আবূ সাল্‌মা রাহ্‌মাতুল্লাহি আয়ায়হি স্বীয় পিতামহ হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন- "একদা রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আমার গৃহে মেহ্‌মানস্বরূপ ছিলেন। তিনি রোযাদার ছিলেন। ইফতারের জন্য আমি তাঁহাকে মধুমিশ্রিত এক পেয়ালা দুধ দিলাম। তিনি আস্বাদন করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, ইহা মিষ্ট এবং জিজ্ঞাসা করিলেন- 'ইহা কি?' আমি নিবেদন করিলাম- 'ইহাতে মধু মিশ্রিত করা হইয়াছে।' তিনি তৎক্ষণাৎ পেয়ালাটি রাখিয়া দিলেন এবং পান না করিয়া বলিলেন- 'আমি ইহাকে (মধু মিশ্রিত দুধকে) হারাম বলিতেছি না। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে নম্রতা অবলম্বন করে, তিনি তাহার শির উন্নত করেন। যে ব্যক্তি অহংকার করে, তিনি তাহাকে হেয় করেন। যে ব্যক্তি অপব্যয় হইতে বিরত থাকে, তিনি তাহাকে পরমুখাপেক্ষী করেন না। যে ব্যক্তি অপব্যয় করে, তিনি তাহাকে পরমুখাপেক্ষী করেন। আর যে ব্যক্তি প্রচুর পরিমাণে আল্লাহ্‌র যিকির করে, তিনি তাহাকে ভালবাসেন।"

একদা এক রোগাক্রান্ত ভিক্ষুক রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া কিছু প্রার্থনা করিল। তখন তিনি আহার করিতেছিলেন। হযরত (সা) তৎক্ষণাৎ তাহাকে নিকটে ডাকিয়া লইলেন। পীড়ার কারণে সকলেই ভিক্ষুকের নিকট হইতে দূরে সরিয়া রহিল। কিন্তু হযরত (সা) তাহাকে স্বীয় পবিত্র উরুর উপর বসাইয়া লইলেন এবং বলিলেন- "কুরায়শ বংশীয় এক ব্যক্তি তৎপ্রতি অবজ্ঞার দৃষ্টিতে চাহিয়াছিলেন। অনন্তর সে এই রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়।" রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- নবী ও বাদশাহ্‌ কিংবা নবী ও বান্দা, এই দুইটির মধ্যে কোন্‌টি হইবে, পছন্দ করিয়া লইবার জন্য মহাপ্রভু আল্লাহ্‌ আমাকে অনুমতি দিলেন। আমি উত্তর দিতে বিলম্ব করিলাম। ফেরেশতাদের মধ্যে আমার বন্ধু জিবরাঈল উপস্থিত ছিলেন। আমি তাঁহার দিকে তাকাইলাম। তিনি বলিলেন- 'বিনয় অবলম্বন করুন।' আমি আল্লাহ্‌র নিকট নিবেদন করিলাম- 'আমি রাসূল ও বান্দা থাকিতে ইচ্ছা করি।'

হযরত মূসা আলায়হিস সালামের নিকট আল্লাহ্‌ ওহী অবতীর্ণ করিলেন- " যে ব্যক্তি আমার মহত্ত্বে বিনয়ী হয়, আমার বান্দাদের সহিত অহংকার করে না, আমাকে আন্তরিকভাবে ভয় করে, সমস্ত দিন আমার স্মরণে অতিবাহিত করে এবং আমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে স্বীয় কৃপ্রবৃত্তিসমূহ হইতে বিরত থাকে, আমি তাহার নামায কবুল করি।" রাসূলে মাক্‌বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "উদারতা পরহেযগারীর মধ্যে, বিনয়ে ভদ্রতা এবং ঐশ্বর্য (অর্থাৎ পরমুখাপেক্ষী না হওয়া) দৃঢ় বিশ্বাসের মধ্যে নিহিত আছে।" তিনি আরও বলেন- "পৃথিবীতে যে ব্যক্তি বিনয়ী, সেই সৌভাগ্যশালী এবং পরকালে সে উচ্চ আসন লাভ করিবে। যে ব্যক্তি পৃথিবীতে

লোকের মধ্যে বিবাদ মিটাইয়া দেয়, তাহাকে বেহেশতে স্থান দান করা হইবে। আর দুনিয়ার কলুষতা হইতে যাহার হৃদয় নির্মুক্ত, সেই পূণ্যবান এবং উহার বিনিময়ে সে আল্লাহ্‌র দীদার (দর্শন) লাভ করিবে।" তিনি একদা সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুমকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন- " তোমাদের মধ্যে ঈমানের মাধুর্য পরিলক্ষিত হয় না কেন?" তাঁহারা নিবেদন করিলেন- "ঈমানের মাধুর্য কি?" তিনি বলিলেন- "বিনয়।" তিনি অন্যত্র বলেন- "বিনয়ী লোকের সহিত নম্রতা অবলম্বন কর এবং অহংকারীর সহিত অহংকার কর, যেন অহংকারের প্রতি ঘৃণা ও অসম্মান প্রকাশ পায়।"

বিনয় সম্বন্ধে বুযুর্গদের উক্তি—হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা বলেন- "তোমরা উৎকৃষ্ট ইবাদতের প্রতি উদাসীন এবং ইহা (উৎকৃষ্ট ইবাদত) বিনয়।" হযরত ফুযাইল (র) বলেন, "হক কথা মানিয়া লওয়াকেই বিনয় বলে; যদিও ইহা কোন মূর্খ বা বালকের মুখ নিঃসৃতই হউক না কেন।" হযরত ইবনে মুবারক রাহ্‌মাতুল্লাহি আলায়হি বলেন- "সাংসারিক ধনৈশ্বর্যে যে ব্যক্তি তোমা হইতে হীন, তাহার নিকট তুমি নিজকে তদপেক্ষা ছোট করিয়া দেখাও, তাহা হইলে সে মনে করিবে সাংসারিক শ্রেষ্ঠত্বের দরুন তুমি গৌরব অনুভব কর না। আবার সাংসারিক সম্পদ ও প্রতিপত্তিতে যে ব্যক্তি তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাহার নিকট তুমি নিজকে তদপেক্ষা বড় করিয়া দেখাও, তাহা হইলে সেও মনে করিবে যে, পার্থিব শ্রেষ্ঠত্বের দরুন তোমার নিকট তাহার কোন মর্যাদা নাই। এই প্রকার ব্যবহারকেই বিনয় বলে।" হযরত সাম্মাক রাহ্‌মাতুল্লাহি আলায়হি খলীফা হারুনুর রশীদকে বলিলেন- "হে আমিরুল মুমিনীন, আপনি এত প্রভাব প্রতিপত্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও যে নম্রতা প্রদর্শন করিয়া থাকেন, ইহা আপনার শ্রেষ্ঠত্ব অপেক্ষা অধিক ভদ্রতার পরিচায়ক।" খলীফা বলিলেন- "হে আমিরুল মুমিনীন, আল্লাহ্ যাহাকে ধন, সৌন্দর্য ও প্রভাব-প্রতিপত্তি দান করিয়াছেন, তিনি যদি ধন পর দুঃখ মোচনে ব্যয় করেন, প্রভাব প্রতিপত্তি লাভ করিয়া নম্রতা অবলম্বন করেন এবং তাহার সৌন্দর্যে যদি পবিত্রতা পরিলক্ষিত হয়, তবে আল্লাহ্ তাঁহার নাম স্বীয় বন্ধুগণের তালিকাতে লিখিয়া লন।" খলীফা এই বাণীসমূহ লিপিবদ্ধ করত নিজের নিকট রাখিয়া দিলেন।

হযরত সুলায়মান আলায়হিস সালাম রাজকার্য পরিচালনার উদ্দেশ্যে প্রত্যুষে ধনীদের সহিত উপবেশন করিতেন এবং তৎপর তিনি গরীবদের সহিত উপবেশন করিয়া বলিতেন- "একজন গরীব অপর গরীবদের সহিত উপবেশন করিল।" হযরত হাসান বসরী (র) বলেন- "গৃহ হইতে যে কেহই দৃষ্টিগোচর হউক না কেন, তাহাকে নিজ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট মনে করাকেই বিনয় বলে।" হযরত মালিক ইব্‌নে দীনার রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন- 'কেহ যদি মসজিদের দ্বারদেশে থাকিয়া আহ্বান করে যে, তোমাদের মধ্যে নিকৃষ্টতম ব্যক্তি বাহির হও, তবে আমি স্বেচ্ছায় সন্তুষ্ট চিত্তে সর্বাগ্রে বাহির হইব।" হযরত ইব্‌নে মুবারক (র) ইহা শুনিয়া বলিলেন- "হযরত

মালিক (র) এইজন্যই আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র হইয়াছেন।" এক দরবেশ হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুকে স্বপ্নে দেখিয়া নিবেদন করিলেন- "আমাকে কিছু উপদেশ দান করুন।" তিনি বলিলেন- "পরকালে সওয়াবের আশায় আমীরের পক্ষে ফকীরের নিকট বিনয়ী হওয়া কত ভাল। আবার আল্লাহ্‌র বদান্যতার উপর নির্ভর করিয়া ফকীরগণ যদি আমীরদের নিকট অহংকার প্রকাশ করে, তবে ইহা ততোধিক উৎকৃষ্ট।" হযরত ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌নে মুয়ায (র) বলেন- "উদার ব্যক্তি পূণ্যবান হইলে বিনয়ী হয়, কিন্তু কোন ইতর লোক পূণ্যবান হইলে সে অহংকারী হইয়া পড়ে।"

হযরত বায়েযীদ রাহ্‌মাতুল্লাহি আলায়হি বলেন- "মানব যতক্ষণ অপরকে আপন অপেক্ষা নিকৃষ্ট জ্ঞান করিবে ততক্ষণ সে অহংকারী থাকিবে।" হযরত জুনায়দ রাহ্‌মাতুল্লাহি আলায়হি এক শুক্রবারে ওয়াযের সময় বলেন- "শেষ যমানায় সমাজের নিকৃষ্ট লোকই নেতা হইবে, হাদীস শরীফে এই উক্তি না থাকিলে আমি তোমাদের সম্মুখে ওয়ায করিতাম না।" তিনি অন্যত্র বলেন- "একত্ববাদীদের নিকট বিনয়ই অহংকার।" অর্থাৎ উচ্চ মর্যাদা হইতে নামিয়া আসাকে বিনয় বলে, আর নীচে নামার আবশ্যকতা দেখা দিলেই বুঝা যায় যে, সে নিজকে উচ্চমর্যাদার অধিকারী বলিয়া মনে করিত। প্রবল ঝড় উঠিলে বা মেঘ গর্জন করিলে হযরত আত্তাসী রাহ্‌মাতুল্লাহি আলায়হি গর্ভবতী নারীর ন্যায় স্বীয় উদর আঁটিয়া ধরিয়া ঘুরাঘুরি করিতেন এব বলিতেন- "আমার পাপের দরুনই মানব জাতির উপর এই বিপদ অবতীর্ণ হইতেছে।' কয়েকজন লোক হযরত সালমান রায়িআল্লাহু আনহুর নিকট উপস্থিত হইয়া গর্ব করিতেছিল দেখিয়া তিনি বলিলেন- "আদিতে আমি একবিন্দু অপবিত্র পানি এবং পরিণামে মৃতদেহ। তৎপর আমাকে দাঁড়ি-পাল্লার নিকট লইয়া যাইয়া ওজন করা হইবে। আমার পূণ্যের পাল্লা ভারী হইলে আমি মহৎ। অন্যথায়, আমি হেয় ও নিকৃষ্ট।"

অহংকারের পরিচয় ও ইহার আপদসমূহ—প্রিয় পাঠক, অবগত হও, অহংকার একটি নিতান্ত মন্দ স্বভাব। প্রতিটি স্বভাবই মানব হৃদয়ের একটি ভাব (এবং হৃদয়েই ইহা নিহিত থাকে)। কিন্তু অহংকারের প্রতিক্রিয়া বাহিরে প্রকাশ পায়। মানব নিজকে অপরলোক অপেক্ষা উৎকৃষ্ট মনে করে এবং এইজন্য সে আনন্দে স্ফীত হইয়া উঠে। যে পদার্থ তাহাকে স্ফীত করিয়া তোলে ইহাকেই অহংকার বলে। অহংকার হইতে অব্যাহতি লাভের জন্যই রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এইরূপ প্রার্থনা করিতে শিক্ষা দিয়াছেন ঃ

اَعُوْذُبِكَ مِنْ نَّفْخَةِ الْكِبْرِ

"ইয়া আল্লাহ্, অহংকারের বায়ূ হইতে রক্ষার জন্য আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।" অহংকাররূপ বায়ু মানব হৃদয়ে উৎপন্ন হইলেই সে অপর লোককে

নিজ অপেক্ষা হীন বলিয়া মনে করে এবং তাহারা দৃষ্টিগোচর হইলে তাহাদিগকে স্বীয় দাসরূপে জ্ঞান করে, বরং অনেক সময় তাহাদিগকে স্বীয় দাসের উপযুক্ত বলিয়াও গণ্য করে না। সে তখন অপর লোককে বলে- "তোমার কি যোগ্যতা আছে যে, নিজকে আমার খেদমতের উপযোগী বলিয়া মনে করিতে পার?" যেমন যথেচ্ছাচারী বাদশাহ্ কাহাকেও তাহার আস্তানা চুম্বন করিতে দিতেও সম্মত হয় না এবং নিজকে তাহাদের সেবক বলিয়া মনে করে না, বরং অপরাপর বাদশাহকে মাত্র তাহার রাজপ্রাসাদে অভ্যর্থনা করে। ইহাই অহংকারের পরাকাষ্ঠা। মহাপ্রভু আল্লাহ্ও মানবকে স্বীয় দাসরূপে গ্রহণ করেন এবং তাহাদের বন্দেগী, সিজদা, সকল ইবাদত কবুল করিয়া থাকেন; কিন্তু সেইরূপ অহংকারী ব্যক্তির অহমিকা আল্লাহ্র অহমিকার সীমাও অতিক্রম করিয়াছে।

যাহার অহংকার তদপেক্ষা কম সে চলিবারকালে অগ্রে চলিতে চায়, উপবেশনের জন্য উচ্চ স্থান অন্বেষণ করে এবং সম্মানের প্রত্যাশী থাকে। তেমন ব্যক্তি অপরের উপদেশ গ্রহণ করে না, অপরকে উপদেশ দানকালে কঠোরতা অবলম্বন করে তাহাকে কোন বিষয় শিক্ষা দিতে গেলে সে ক্রুদ্ধ হয় এবং অপর লোক নয়নগোচর হইলে হিংস্র জন্তুর প্রতি যেরূপ ক্রোধের সঞ্চার হয় তাহার হৃদয়েও তদ্রূপ ক্রোধের উদ্রেক হইয়া থাকে। রাসূলে মাক্বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাস করা হইল- "ইয়া রাসুলাল্লাহ্, অহংকার কাহাকে বলে?" তিনি বলিলেন- "আল্লাহ্র নিকট গ্রীবা নত না করা এবং অপরকে ঘৃণার চক্ষে দেখা।" এই দুইটি স্বভাব আল্লাহ্ ও মানবের মধ্যে এক বড় অন্তরালের সৃষ্টি করে এবং উহা হইতে সমস্ত কুস্বভাব উৎপন্ন হয় ও মানব সৎস্বভাব অর্জনে বঞ্চিত থাকে।

অহংকারের নিদর্শন—যে ব্যক্তি স্বীয় প্রভুত্ব, সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্বের চিন্তায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে তাহার অবস্থা এইরূপ হইয়া থাকে- (১) সে নিজের জন্য যাহা পছন্দ করে অপর মুসলমানের জন্য তাহা কখনই পছন্দ করিতে পারে না। ইহা ঈমানের লক্ষণ নহে। (২) কাহারও সহিত সে নম্র ব্যবহার করিতে পারে না। ইহা পরহেযগারদের স্বভাব নহে। (৩) সে দ্বেষ, ঈর্ষা ও ক্রোধকে প্রতিরোধ করিতে অক্ষম হয়। (৪) সে স্বীয় রসনাকে গীবত হইতে বাঁচাইতে সমর্থ হয় না। (৫) সে নিজ হৃদয়কে কলুষমুক্ত রাখিতে পারে না। কারণ, অপর লোকে তাহাকে সম্মান প্রদর্শন না করিলে সে অবশ্যই কিছু না কিছু ভাবিয়া থাকিবে। অন্ততপক্ষে, সে দিবা-রাত্র আত্মপূজা ও স্বীয়কথা সমুন্নত রাখার চিন্তায় ব্যাপৃত থাকে। আর (৬) নিজের কাজ অপরের নিকট বড় বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে সে প্রবঞ্চনা, কপটতা ও মিথ্যা হইতে অব্যাহতি পায় না।

বাস্তবিক কথা এই যে, যে পর্যন্ত মানুষ আত্মবিস্মৃত না হইবে সে পর্যন্ত সে ইসলামের সামান্য গন্ধটুকুও পাইবে না, এমনকি পার্থিব শান্তিও সে লাভ করিতে

পারিবে না। এক বুযুর্গের উক্তি এই যে, তুমি যদি বেহেশ্তের সুগন্ধ পাইতে চাও তবে নিজকে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট মনে কর। দুইজন অহংকারী লোক পরস্পর মিলিত হইলে অন্তদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি দেখিতে পাইবে যে, তাহাদের উভয়ের মনে মধ্যে যেরূপ মলমূত্র ও দুর্গন্ধ জমা হইয়া রহিয়াছে তদ্রূপ কোন ময়লার স্তূপেও নাই। কারণ, অহংকারীদের অভ্যন্তরীণ আকৃতি কুকুরের ন্যায় এবং তাহাদের বহিরাবরণ কুলটা রমণীদের ন্যায়। মুসলমানগণ পরস্পর মেলামেশা করিলে তাহাদের মধ্যে যে ভালবাসার সৃষ্টি হয়, অহংকারীদের মধ্যে তদ্রূপ হয় না।

শান্তি লাভের উপায়—প্রিয় পাঠক, তুমি যখন অপরের জন্য যথাসর্বস্ব বিসর্জন দিতে পার এবং তোমার আপাদমস্তক তাহার প্রতি ভক্তিভাবে অবনত হইয়া থাকে যেন দ্বিত্বভাব বিদূরিত হইয়া একাত্মবোধ জাগিয়া উঠে, যেন সেই আছে, তুমি নাই, বা সে তোমাতে বিলীন হইয়া যায় এবং তুমিই অবশিষ্ট থাক, অথবা তোমরাই উভয়ই আল্লাহ্তে আত্মসমর্পণ করত স্বীয় অস্তিত্ব ভুলিয়া যাইতে পার, কেবল তখনই তুমি প্রকৃত শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হইবে। নিজের প্রতি দৃষ্টিপাত না করাই মানবের চরমোৎকর্ষ ও তদ্রূপ অন্তরঙ্গতা হইতেই পূর্ণ শান্তি লাভ হইয়া থাকে। মোটকথা, এই যে, দ্বিত্বভাব বিদূরিত না হইলে শান্তি লাভ হইবে না। কারণ, অন্তরঙ্গতা ও খেদমত (সেবা) হইতেই শান্তির উদ্ভব হইয়া থাকে। উপরে যাহা বর্ণিত হইল বাস্তবপক্ষে ঐ সকলই অহংকারের আপদ।

অহংকারের শ্রেণীভেদ—প্রিয় পাঠক, জানিয়া রাখ, কোন কোন অহংকার নিতান্ত জঘন্য ও নিন্দনীয়। যাহার উপর অহংকার প্রকাশ করা হয় তাহার গুরুত্ব-লঘুত্বের তারতম্যানুসারে অহংকারের গুরুত্ব-লঘুত্বেও তারতম্য হইয়া থাকে। অহংকার তিন প্রকারেই হইতে পারে- আল্লাহ্র প্রতি, তদীয় রাসূল (সা) বা অপর লোকের প্রতি।

প্রথম শ্রেণীর অহংকার—নমরূদ, ফিরাউন, শয়তান এবং অপরাপর যাহারা স্বয়ং আল্লাহ্ বলিয়া দাবী করিয়াছে ও মহাপ্রভু আল্লাহ্র ইবাদত করিতে লজ্জাবোধ করিয়াছে, তাহাদের অহংকার এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্ বলেন-

لَنْ يَّسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ اَنْ يَّكُوْنَ عَبْدًا لِّلّٰهِ وَلَا الْمَلٰئِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ

"মসীহ কখনও আল্লাহ্র বান্দা বলিয়া স্বীকার করিতে লজ্জাবোধ করিবেন না এবং না নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশ্তাগণ।" (সূরা নিসা, শেষ রুকু ৬ পারা)।

দ্বিতীয় শ্রেণীর অহংকার—রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতি অহংকার এই শ্রেণীর অন্তর্গত। যেমন কুরায়শ বংশীয় কাফিরগণ অহংকারে বলিত- "আমাদের মত মানুষের নিকট আমরা মস্তক অবনত করিব না। আচ্ছা,

আল্লাহ্ কেন ফেরেশতাকে (রাসূল করিয়া) আমাদের নিকট পাঠাইলেন না? একজন য়াতীমকে কেন পাঠাইলেন?" তাহাদের উক্তি উল্লেখ করিয়া আল্লাহ্ বলেন–

وَقَالُوْا لَوْلَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ

"আর তাহারা (কুরায়শগণ) বলিল—এই দুই নগরের (মক্কা ও তায়িফের) কোন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির উপর কুরআন নাযিল করা হয় নাই কেন?" (সূরা যুখরুফ, ৩ রুকু, ২৫ পারা)। এইরূপ অহংকারী কাফিরগণ দুই দলে বিভক্ত ছিল। এক দল অহংকারে সমাচ্ছন্ন রহিল এবং ইহাই তাহাদের অন্তরাল হইয়া দাঁড়াইল। ফলে, তাহারা গভীরভাবে মনোনিবেশ ব্যতিরেকে না বুঝিয়াই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে নবী বলিয়া অস্বীকার করিল। যেমন আল্লাহ্ বলেন –

سَاَصْرِفُ عَنْ اٰيَاتِىَ الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ

"যাহারা দুনিয়াতে অযথা অহংকার করে নিশ্চয় আমি তাহাদিগকে নিজের নিদর্শনাবলী হইতে ফিরাইয়া দিব।" অর্থাৎ তাহারা আল্লাহ্র নিদর্শনাবলী দেখিয়া উপদেশ গ্রহণ করিতে পারিবে না (সূরা আরাফ, ১৭ রুকূ, ৯ পারা)। কাফিরদের অপর দল হযরতকে (সা) নবী বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিল ; কিন্তু অহংকারবশত তাহারা স্বীকার করিতে পারে নাই। যেমন আল্লাহ্ বলেন–

وَجَحَدُوْا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا اَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَّعُلُوًّا

"তাহাদের অন্তঃকরণ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা সত্ত্বেও অন্যায়ভাবে ও অহংকার করিয়া তাহারা অস্বীকার করিল" (সূরা নহল, ১ রুকু, ১৯ পারা)।

তৃতীয় শ্রেণীর অহংকার–অপর লোকের প্রতি অহংকার। তাহাদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখা, তাহাদের সত্য কথাও গ্রহণ না করা, নিজকে অপর লোক অপেক্ষা ভাল এবং শ্রেষ্ঠ মনে করা এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এই শ্রেণীর অহংকার প্রথম দুই শ্রেণী অপেক্ষা লঘু হইলেও দুইটি কারণে ইহা নিতান্ত গুরুতর।

প্রথম কারণ—আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কাহারও পক্ষে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করা শোভা পায় না এবং ইহা একমাত্র আল্লাহ্রই একক গুণ। মানুষ নিতান্ত দুর্বল ও নিঃসহায় এবং তাহার হস্তে কোন ক্ষমতাই নাই। এমতাবস্থায়, তাহার পক্ষে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করা ও নিজকে উপযুক্ত বলিয়া মনে করা কিরূপে শোভা পাইতে পারে ? মানুষ নিজকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিলে মহাপ্রভু আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করা হয়। ইহা কোন দাসের পক্ষে বাদশাহ্র মুকুট পরিধানপূর্বক সিংহাসনে উপবেশন করার সমতুল্য। ভাবিয়া দেখ, তদ্রূপ দাস কিরূপ ভয়ানক শাস্তির উপযোগী হইবে! এইজন্যই হাদীসে উক্ত হইয়াছে, আল্লাহ্ বলেন–

اَلْعَظْمَةُ اِزَارِىْ وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَائِىْ فَمَنْ نَّازَعَنِىْ فِيْهِمَا قَصَمْتُهُ

"শ্রেষ্ঠত্ব ও আত্মগর্ব একমাত্র আমার নিজস্ব গুণ। যে ব্যক্তি উহা লইয়া আমার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে আমি তাহাকে ধ্বংস করিয়া দিব।" অতএব, আল্লাহ্ ব্যতীত আর কাহারও পক্ষে অহংকার শোভন নহে। অনন্তর যে ব্যক্তি অপর লোকের প্রতি অহংকার প্রদর্শন করে সে যেন আল্লাহ্র সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিল। তাহা হইলে একমাত্র বাদশাহ্র জন্য যাহা শোভা পায় তদ্রূপ কার্যের আদেশ যেন দাসকে দেওয়া হইল।

দ্বিতীয় কারণ—অহংকার অপরের হক কথাও গ্রহণ করিতে দেয় না। অহংকারী ব্যক্তি অপরের সহিত ধর্ম বিষয় লইয়া ঝগড়ায় প্রবৃত্ত হয়। অপরে সত্য কথা বলিলেও সে অহংকারবশত ইহা অস্বীকার করে। ইহাই কাফির ও মুনাফিকদের স্বভাব; যেমন আল্লাহ্ বলেন–

لَا تَسْمَعُوْا لِهٰذَ الْقُرْاٰنِ وَالْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ

"(কাফিরগণ বলিয়াছিল) তোমরা এই কুরআন শ্রবণ করিও না; বরং ইহা পাঠকালে হট্টগোল কর। তাহা হইলে (তোমরা মুসলমানদের উপর) জয়ী হইবে' (সূরা হা-মীম সিজদা, ৪ রুকূ, ২৪ পারা)। এই সম্পর্কে আল্লাহ্ অন্যত্র বলেন–

وَاِذَا قِيْلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ

"আর যখন তাহাকে বলা হয়– আল্লাহ্কে ভয় কর, তখন অহংকার তাহাকে পাপ কার্য জেদ ধরিতে প্রবৃত্ত করে" (সূরা বাক্বারা, ২৫ রুকূ, ২ পারা)। হযরত ইব্ন মাসঊদ রাযিআল্লাহু আন্হু বলেন– "কোন ব্যক্তিকে এই কথা বলিলে যে, আল্লাহ্কে ভয় করে, সে যদি বলে– 'তুমি নিজের কাজ কর, তবে ইহা মহাপাপ।"

অহংকারের অনিষ্টকারিতা—একদা রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে বাম হস্তে আহার গ্রহণ করিতে দেখিয়া ডান হস্তে আহার করিতে বলিলেন। সেই ব্যক্তি বলিল– "আমি (ডান হস্তে) আহার করিতে পারি না।" হযরত (সা) বুঝিতে পারিলেন যে, অহংকারের বশীভূত হইয়াই সে এইরূপ উত্তর দিয়াছে। তৎপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন– "তুমি কি ডান হস্তে আহার করিতে পার না?" তৎক্ষণাৎ দেখা গেল যে, সেই ব্যক্তি হাত অবশ হইয়া গিয়াছে। কুরআন শরীফে শয়তানের কাহিনীটি আল্লাহ্ গল্পস্বরূপ বর্ণনা করেন নাই। বরং অহংকার লোকের কি ভীষণ ক্ষতি সাধন করিতে পারে, কেবল ইহা দেখাইবার জন্যই বলিয়াছেন–

اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِىْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنٍ

"আমি তাহা (আদম) অপেক্ষা উত্তম। তুমি আমাকের অগ্নি দ্বারা সৃজন করিয়াছে, আর তাহাকে (আদমকে) মৃত্তিকা দ্বারা সৃজন করিয়াছ" (সূরা আরাফ, ২

রুকু, ৮ পারা)। অহংকার শয়তানকে এতটুকু বাড়াইয়া দিল যে, শেষ পর্যন্ত সে আল্লাহ্‌র আদেশ লঙ্ঘন করিল, হযরত আদম আলায়হিস্ সালামকে সিজদা করিল না এবং ফলে চির অভিশপ্ত হইয়া রহিল।

অহংকারের কারণসমূহ ও উহা হইতে অব্যাহতির উপায়

অহংকারের কারণ—প্রিয় পাঠক, জানিয়া রাখ, অহংকারী ব্যক্তিমাত্রই ধারণা করে যে, তাহার মধ্যে এমন বিশেষ গুণ আছে যাহা অপরের মধ্যে নাই। এইরূপ গুণের উপলব্ধি হইতেই অহংকার জন্মিয়া থাকে এবং ইহার সাতটি কারণ রহিয়াছে।

প্রথম কারণ—বিদ্যা। বিদ্বান ব্যক্তি নিজকে জ্ঞানে বিভূষিত দেখিয়া তাহার তুলনায় অপরকে পশু তুল্য বিবেচনা করে। এই অহংকার তৎপর তাহার হৃদয়ে প্রবল হইয়া উঠে। ইহার নিদর্শন এই যে, সে তখন সকলের ভক্তিশ্রদ্ধা ও অনুগ্রহ পাইবার জন্য সে আশ্চর্য বোধ করে। কাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বা কাহারও দাওয়াত কবূল করিলে সে তৎপ্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিল বলিয়া প্রকাশ করে। এইরূপ অহংকারী বিদ্বান ব্যক্তি স্বীয় ইলম দ্বারা লোকের উপকার সাধন করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ করে। পরকালের কার্যে সে আল্লাহ্‌র নিকট নিজকে সর্বোৎকৃষ্ট মনে করে এবং স্বীয় পরিত্রাণের প্রবল আশা পোষণ করে, কিন্তু অপর লোকের জন্য সে সন্দেহ প্রকাশ করে এবং তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শন করিয়া বলে– "প্রত্যেকেই আমার উপদেশ ও দোয়ার মুখাপেক্ষী। আমার কারণেই তাহারা দোযখ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবে।" এইজন্যই রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–

اَفَةُ الْعِلْمِ الْجَحْلاَءُ

অর্থাৎ "নিজে নিজকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করা ইলমের আপদ।" তদ্রূপ বিদ্বানকে আলিম না বলিয়া জাহিল বলা সঙ্গত।

প্রকৃত আলিমের অবস্থা– বাস্তবিকপক্ষে, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত আলিম যাঁহার হৃদয়ে পরকালের ভয় সর্বদা জাগরূক থাকে এবং যিনি 'সিরাতুল মুস্তাকীম' নামক সরল সোজা পথের সূক্ষ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে সম্যকরূপে অবগত আছেন। এমন ব্যক্তি সর্বদাই তদ্রূপ উক্তি হইতে বিপদের কারণ হইয়া পড়ে, এই ভাবনায় কখনও তিনি আত্মগর্ব ও অহংকারে প্রবৃত্ত হন না। যেমন হযরত আবূ দারদা রাযিআল্লাহু আন্‌হু বলেন যে, জ্ঞান যতই বৃদ্ধি পায় বিপদও ততই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

বিদ্বান ব্যক্তির অহংকারের কারণ– দ্বিবিধ কারণে বিদ্বান ব্যক্তির হৃদয়ে অহংকার বৃদ্ধি পায়। প্রথম – ধর্মবিদ্যা শিক্ষা না করা। ধর্মবিদ্যাই প্রকৃত বিদ্যা। ইহা শিক্ষা করিলে মানব আত্মজ্ঞান লাভ করে, ধর্মপথের সঙ্কটসমূহ এবং আল্লাহ্‌র ভয়জনিত বেদনা বৃদ্ধি পায়, স্বীয় অসহায়তা প্রকাশ পায় এবং দর্পচূর্ণ হইয়া যায়।

কিন্তু চিকিৎসাবিদ্যা, গণিত, জ্যোতিষ, ভাষাজ্ঞান ও তর্কশাস্ত্র শিক্ষা করিলে কেবল অহংকারই বর্ধিত হইয়া থাকে। ইলমে ফত্‌ওয়া অর্থাৎ ধর্মব্যবস্থা জ্ঞান ধর্মবিদ্যার প্রায় সমতুল্য। ইলমে ফত্‌ওয়া মানবের দোষসমূহ সংশোধন করে। তথাপি ইহা সাংসারিক বিদ্যার অন্তর্গত, যদিও ধর্মক্ষেত্রে ইহার আবশ্যকতা আছে। এই বিদ্যা মানব হৃদয়ে পরকালের ভয় জন্মাইয়া দিতে পারে না। বরং অন্য ইলম পরিত্যাগপূর্বক একমাত্র ইলমে-ফত্‌ওয়াকে যথেষ্ট মনে করিলে হৃদয় মলিন হইয়া পড়ে এবং অহংকার প্রবল হইয়া উঠে। কেবল অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিই ইহা বুঝিতে পারেন।

প্রিয় পাঠক, অপরিপক্ক আলিমগণের দুরবস্থার প্রতি অবলোকন কর। আর আত্মশুদ্ধিজ্ঞান বিবর্জিত বক্তাদের জ্ঞান, ছন্দবিন্যাস, নিরর্থক বাক্য, শ্রোতৃমণ্ডলীল মধ্যে হর্ষোদ্দীপক সুললিত বচন এবং অন্য মযহাবের দোষ-ত্রুটি বর্ণনার প্রতিও মনোনিবেশ কর। সাধারণ লোকে শুনিয়া যেন তদ্রূপ বাহুল্য বিষয়কে ধর্মের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করে, এজন্যই তাহারা মনোমুগ্ধকর বক্তৃতা করিয়া বেড়ায়। উহাতে লোকের মনে অহংকার, ঈর্ষা, শত্রুতা প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তির বীজ রোপিত হয়। উহাতে মানবের অক্ষমতার উপলব্ধি ও ধর্মকার্যে তাহার অকপটতা বৃদ্ধি পায় না বরং আত্মগর্ব ও অহংকার জন্মে মাত্র।

দ্বিতীয়—ধর্মজ্ঞানের উদ্দেশ্য পরিবর্তন। কেহ কেহ হয়ত ধর্ম বিষয়ে কল্যাণকর বিদ্যা, যেমন– তাফসীর, হাদীস, বুযুর্গদের জীবনচরিত্র পাঠ এবং এই গ্রন্থ ও ইয়াহ্‌ইয়াউল উলুমে বর্ণিত বিদ্যাতুল্য ইল্‌ম অর্জন করে। কিন্তু তথাপি তাহারা অহংকারী হইয়া পড়ে। ইহার কারণ এই যে, তাহাদের হৃদয়ই কলুষিত এবং তাহাদের স্বভাবও মন্দ। লোকের নিকট বর্ণনা করত বাহাদুরী প্রকাশ করাই তাহাদের বিদ্যার্জনের একমাত্র উদ্দেশ্য, এতদ্ব্যতীত ইলমা অনুযায়ী কার্য করা তাহাদের উদ্দেশ্য থাকে না। সুতরাং তাহাদের অর্জিত ইলমও তাহাদের আন্তরিক অবস্থার অনুরূপই থাকে, যেমন জোলাপের অগ্রে যে ঔষধ পাকস্থলীতে প্রবেশ করে, ইহা পাকস্থলীর প্রকৃতিই গ্রহণ করে। আবার দেখ, বৃষ্টির পানি আকাশ হইতে পড়িবার কালে একইরূপ নির্মল ও পবিত্র থাকে। কিন্তু ভূপৃষ্ঠে পতিত হওয়ার পর ইহা যে বৃক্ষলতার মূলে প্রবেশ করে ইহারই গুণপ্রাপ্ত হইয়া তদ্রূপ গুণের মাত্রাই বৃদ্ধি করিয়া দেয়। যে বৃক্ষের স্বাদ তিক্ত, ইহার তিক্ততা বৃদ্ধি করে এবং যে বৃক্ষের স্বাদ মিষ্ট, ইহার মিষ্টতা বৃদ্ধিপাপ্ত হয়।

হযরত আব্বাস রাযিআল্লাহু আন্‌হু হইতে বর্ণিত আছে যে রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন– "কোন কোন লোকে কুরআন শরীফ পাঠ করে, কিন্তু ইহা তাহাদের কণ্ঠ-নালীর নিম্নগামী হয় না এবং তাহারা দাবী করে যে, তাহাদের ন্যায় কুরআন পাঠকারী আর কেহই নাই এবং তাহারা যাহা জানে তাহা অপর কেহই জানে না।" তৎপর তিনি সাহাবাগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করত আবার

বলিলেন– "এইরূপ লোক তোমাদের মধ্যেই হইবে, অর্থাৎ আমার উম্মতের মধ্যে হইবে এবং সেইরূপ লোক সকলেই দোযখী।" হযরত ওমর রাযিআল্লাহু আন্হু বলেন– "হে লোকগণ, তোমরা অহংকারী আলিমদের দলভুক্ত হইও না। অন্যথায় মুর্খতার প্রতিকূলে ইলম তোমাদের কোন উপকারই করিবে না।" রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে বিনয় অবলম্বনের আদেশ প্রদান করিয়া আল্লাহ্ বলেন–

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

"আর আপনি স্বীয় বাহু সেই মু'মিন ব্যক্তির জন্য অবনত করুন, যে আপনার অনুসরণ করে" (সূরা শু'আরা, ১১ রুকূ, ১৯ পারা)। এই কারণেই সাহাবাগণ (রা) সর্বদা শঙ্কিত চিত্তে অহংকার হইতে বিরত থাকিতেন।

হযরত হুযায়ফা রাযিআল্লাহু আন্হু একবার নামাযের ইমামতি করিলেন। নামাযান্তে তিনি মুসল্লিগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন– "আপনারা অপর কাহাকেও ইমাম নিযুক্ত করিয়া লউন, কেননা (ইমামতি করিলে) আমার মনে এই ভাব আসে যে, আমি আপনাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।" তাঁহার মত ব্যক্তিও যখন অহংকারের অমূলক চিন্তা হইতে অব্যাহতি লাভ করেন নাই, এমতাবস্থায়, অপর লোকে কিরূপে ইহা হইতে অব্যাহতি পাইবে? হযরত হুযায়ফার (রা) ন্যায় আলিমই-বা এইকালে কোথায় পাওয়া যাইবে ? বরং অহংকারকে নিন্দনীয় বলিয়া জানে এবং ইহা পরিহার করা উচিত মনে করে, এমন আলিমই আজকাল নিতান্ত বিরল হইয়া পড়িয়াছে। কেননা, বর্তমানে সাধারণত আলিমগণ এ বিষয়ে উদাসীন হইয়া রহিয়াছে এবং তাহারা অহংকার করিয়া গর্ববোধ করে। আর তাহারা বলে– "অমুক ব্যক্তির কোন উপযুক্ততা আছে বলিয়া আমি মনে করি না, অমুককে অপদার্থ বলিয়া জানি এবং তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেও আমি পছন্দ করি না।" এই প্রকার অহংকারপূর্ণ বহু উক্তি তাহারা করিয়া থাকে। অহংকারের অপকারিতা সম্বন্ধে অবগত আছে এবং নিজে অহংকারী নহে এমন আলিম বর্তমানকালে অতি বিরল। অহংকারশূন্য আলিমের প্রতি দৃষ্টিপাত করাও ইবাদতের মধ্যে গণ্য এবং তাহার জন্য জগতের আর সকলকেই পরিত্যাগ করা যায়।

শেষ যুগের অল্প কার্যে অধিক পুণ্য—হাদীস শরীফে উক্ত হইয়াছে– "এমন এক সময় আসিবে যখন লোকে তোমাদের এক-দশমাংশ ইবাদত করিয়াও পরিত্রাণ পাইবে।" এই আশ্বাস বাণী হাদীসে না থাকিলে বর্তমানকালে লোকের পক্ষে নিরাশ হইয়া পড়ার আশংকাই ছিল। কিন্তু অধুনা সামান্য সৎকার্যেই অধিক পুণ্য লাভের আশা আছে, কেননা, ধর্ম-কর্মে এমন কোন সহায়ক নাই, খাঁটি ধর্মও বিচ্ছিন্ন হইয়া রহিয়াছে। ধর্মপথে চলিতে চাহিলে সাধারণত তাহাকে একাকীই চলিতে হয়, কেহই

তাহার সাহায্যকারী হয় না। সুতরাং তাহাকে দ্বিগুণ পরিশ্রম করিতে হয়। এমতাবস্থায়, অল্প কার্যেই পরিশ্রান্ত হইয়া সে পরিতুষ্ট থাকে।

দ্বিতীয় কারণ—সংসার-বিরাগ ও ইবাদতের দরুন অহংকার। ইহার কারণ এই যে, অধুনা আবিদ, সংসার-বিরাগী সূফী দরবেশগণও অহংকারশূণ্য নহে। এমনকি তাহারা অপর লোকের পক্ষে তাহাদের দর্শনলাভ পুণ্যজনক বলিয়া মনে করে। ইবাদত করিয়া যেন তাহারা অপর লোকের উপকার করিতেছে, এইরূপ ধারণা করে। তাহারা আরও মনে করে যে, অপর লোক আল্লাহ্‌র শাস্তিতে ধ্বংস হইবে এবং একমাত্র তাহারাই মুক্তি লাভ করিবে। তাহাদিগকে কেহ কোন কষ্ট দিলে অকস্মাৎ সে যদি কোন কষ্টে নিপতিত হয়, তবে ইহাকে তাহারা নিজেদের কারামত (অলৌকিক কার্য) বলিয়া মনে করে এবং বলে– "আমাদের সহিত যে অসদ্ব্যবহার করে তাহার পরিণাম এইরূপ হইয়া থাকে।" রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন– "যে ব্যক্তি বলে যে, অপর লোক বিনষ্ট হইল, সে নিজেই বিনষ্ট হইবে।" কারণ, সেই ব্যক্তি অপরকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া নিজে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে। তিনি আরও বলেন,– "কোনও মুসলমান ভ্রাতাকে তুচ্ছজ্ঞান করা মহাপাপ! যে আবিদ নিজকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া অপর মুসলমানকে তুচ্ছজ্ঞান করে, সেই ব্যক্তি, আর যে ব্যক্তি অপর মুসলমানকে উৎকৃষ্ট জানিয়া তাহার নিকট হইতে পারলৌকিক সৌভাগ্য অর্জনে ব্যাপৃত থাকে এবং আল্লাহ্‌র জন্য তাহাকে ভালবাসে, এই উভয় ব্যক্তির মধ্যে বিরাট পার্থক্য রহিয়াছে। ইহা অসম্ভব নহে যে, মহাপ্রভু আল্লাহ্ এইরূপ অহংকারী আবিদকে ইবাদতের পুণ্য হইতে বঞ্চিত করিয়া উক্ত ব্যক্তিকে দরবেশীর উন্নত মর্যাদা প্রদান করিবেন।

কাহিনী—বনী ইসরাঈল বংশে একজন খুবই দীনদার আবিদ ছিল, আবার অপর এমন এক দুরাচার পাপিষ্ঠও ছিল যে, তাহার কোন জোড়া ছিল না। একবার দেখা গেল যে, ঐ আবিদ উপবেশন করিয়া রহিয়াছে এবং এক খণ্ড মেঘ তাহার মস্তকোপরি ছায়া প্রদান করিতেছে। ইহা দেখিয়া পাপিষ্ঠ ব্যক্তি মনে করিল, ঐ আবিদের সঙ্গে উপবেশন করিলে তাঁহার বরকতে আল্লাহ্ হয়ত আমাকে ক্ষমা করিয়া দিতে পারেন।তৎপর সে যাইয়া আবিদের পার্শ্বে আসন গ্রহণ করিল। আবিদ তাহাকে বলিল– "রে নরাধম, তোর মত পাপিষ্ঠ দুনিয়াতে আর কে আছে ? কোন্ সাহসে তুই আমার পার্শ্বে উপবেশন করিলি ? শীঘ্র দূর হ'।" ইহাতে পাপিষ্ঠ ব্যক্তি উঠিয়া চলিল; কিন্তু উক্ত মেঘ খণ্ডটিও তাহার মস্তকোপরি ছায়া প্রদান করিতে করিতে যাইতে লাগিল। তৎকালীন নবী আলায়হিস সালামের প্রতি আল্লাহ্ ওহী অবতীর্ণ করিলেন– "সেই পাপিষ্ঠ ও আবিদ উভয়কে নতুনভাবে ইবাদতকার্য আরম্ভ করিতে বলিয়া দাও। কারণ, সুধারণার ফলে পাপীর পাপ মোচন হইয়াছে এবং অহংকারের দোষে আবিদের ইবাদতসমূহ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।"

জনৈক ব্যক্তি এক দরবেশের গ্রীবাদেশে স্বীয় পদ স্থাপন করিল। দরবেশ সেই ব্যক্তিকে বলিল– "পা সরাইয়া লও। অন্যথায় আল্লাহ্‌র শপথ, তিনি তোমার উপর দয়া করিবেন না।" তদানীন্তন নবী আলায়হিস সালামের উপর ওহী অবতীর্ণ হইল– সেই দরবেশকে বলিয়া দাও, সে আমার শপথ করিয়া ঐ ব্যক্তিকে ক্ষমা করিতে নিষেধ করিতেছে, বরং আমি সেই দরবেশকেই ক্ষমা করিব না।"

সচরাচর দেখা যায়, কেহ কোন দরবেশকে কষ্ট দিলে তিনি মনে করেন, কষ্টদাতা আল্লাহ্‌র বরকত হইতে বঞ্চিত থাকিবে এবং তদ্রূপ স্থলে হয়ত দরবেশ এমন উক্তিও করেন– "যে ব্যক্তি আমাকে কষ্ট দিল সে অতি সত্বর স্বীয় ধৃষ্টতার শাস্তি ভোগ করিবে।" আবার ঘটনাক্রমে তাহার উপর কোন বিপদ আসিলে দরবেশ বলে– "দেখিলে, তাহার কি হইয়াছে? আমার অলৌকিক ক্ষমতাবলেই ইহা ঘটিয়াছে।" অথচ এই নির্বোধ দরবেশ ভাবিয়া দেখে না যে, বহু কাফির রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে কষ্ট দিয়াছিল, কিন্তু আল্লাহ্ ইহার প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নাই। পক্ষান্তরে, তাহাদের অনেকেই তিনি ইসলামরূপ অমূল্যরত্নে পুরস্কৃত করিয়াছিলেন। আল্লাহ্ রক্ষা করুন! ঐ নির্বোধ দরবেশ কি নিজকে নবী সম্রাট রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করে যে, আল্লাহ্ তাহার নিমিত্ত প্রতিশোধ গ্রহণ করিবেন ? মুর্খ দরবেশ এইরূপেই হইয়া থাকে। কিন্তু মানুষের উপর কোন বিপদ আসিলে বুদ্ধিমান দরবেশ মনে করেন যে, তাঁহার পাপ ও কপটতার দরুনই এই বিপদ অবতীর্ণ হইয়াছে। যেমন হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুর জীবন অতি পবিত্র ও তাঁহার নিয়ত নিতান্ত বিশুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও তিনি হযরত হুযায়ফা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন– "দেখুন ত, আমাতে কপটতার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় কিনা ?"

মোটের উপর কথা এই যে, খাঁটি মুসলমানগণ পরহেযগার হওয়া সত্ত্বেও সর্বদা ভয়ে ভীত ও সন্ত্রস্ত থাকে। আর মুর্খ দরবেশগণ প্রকাশ্যে ইবাদত করে বটে, কিন্তু তাহাদের হৃদয় অহংকার ও গর্বে অলুষিত থাকে; অথচ এইজন্য তাহারা বিন্দুমাত্রও ভয় করে না। বাস্তবিক পক্ষে যে ব্যক্তি নিজকে অপর অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে করে মুর্খতার কারণে সে স্বীয় ইবাদত নষ্ট করিয়া ফেলে, কেননা মুর্খতা অপেক্ষা বড় পাপ আর নাই। সাহাবাগণ (রা) একদা জনৈক ব্যক্তির প্রশংসা করিতেছিলেন। এমন সময় ঘটনাক্রমে সেই ব্যক্তি তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলে তাঁহারা রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট নিবেদন করিলেন– "এই ব্যক্তিরই আমরা প্রশংসা করিতেছিলাম।" হযরত (সা) বলিলেন– "এই ব্যক্তির মধ্যে কপটতার নিদর্শন পরিলক্ষিত হইতেছে।" সমবেত সাহাবাগণ (রা) ইহা শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন। সেই ব্যক্তি হযরতের (সা) নিকটবর্তী হইলে তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন– "ওহে, সত্য করিয়া বলত, এই সম্প্রদায়ের মধ্যে তুমিই সর্বোকৃষ্ট, এই

ধারণা কি তোমার হৃদয়ে উদিত হয় ?" সেই ব্যক্তি নিবেদন করিল– "হ্যাঁ।" হযরত (সা) নবুওয়াতের আলোকে তাহার ভিতরের অপবিত্রতা দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং ইহাকে কপটতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। দরবেশ ও আলিমদের মধ্যে অহংকারই অতি বড় মারাত্মক আপদ।

অহংকারী দরবেশ ও আলিমের শ্রেণীবিভাগ—অহংকার বিষয়ে দরবেশ ও আলিমদিগকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

প্রথম শ্রেণী– এই শ্রেণীর লোকগণ নিজ নিজ হৃদয়কে সম্পূর্ণরূপে অহংকারশূন্য করিতে অক্ষম হইলে কষ্টেসৃষ্টে বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করিয়া থাকে। যে লোক নিজকে অপর অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে করে না, তাহারা তদ্রূপ লোকের ন্যায়ই আচরণ করিয়া থাকে। বাক্যে ও কার্যে কোন প্রকারেই তাহাদের অহংকার প্রকাশ পায় না। এই শ্রেণীর লোকেরা অহংকাররূপ বৃক্ষ স্ব স্ব হৃদয় হইতে সমূলে উৎপাটন করিতে না পারিলেও ইহার শাখা-প্রশাখাসমূহ একেবারে কাটিয়া ফেলিয়াছে।

দ্বিতীয় শ্রেণী—অন্তরের গুপ্ত অহংকার লুকাইবার উদ্দেশ্যে এই শ্রেণীর লোকেরা নিজেদের রসনা সংযত রাখে এবং বলে– "আমি নিজকে সকলের চেয়ে নিকৃষ্ট বলিয়া মনে করি।" কিন্তু তাহাদের ব্যবহার ও আচরণে এমন সব বিষয় প্রকাশ পাইয়া থাকে, যাহাতে তাহাদের অন্তরস্থ গুপ্ত অহংকারের প্রমাণ পাওয়া যায়; যেমন– সভা-সমিতিতে গমন করিলে সভাপতির আসনের জন্য লালায়িত থাকে এবং পথ চলিবার কালে অগ্রে অগ্রে চলে। এই শ্রেণীর আলিম নিজদিগকে লাঞ্ছিত প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে স্বীয় মস্তক একদিকে ঝুঁকাইয়া রাখে। আবার এই শ্রেণীর দরবেশ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রাখে, যেন মনে হয় লোকের উপর তাহারা রাগান্বিত। এইরূপ নির্বোধ দরবেশ ও আলিমগণ বুঝিতে পারে না যে, মাথা ঝুঁকানো এবং ভ্রূকুঞ্চিত করা ইলম ও আমল নহে। বরং হৃদয়ের সহিত ইলম ও আমলের সম্পর্ক। বিনয়, রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম নিখিল বিশ্বে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আলিম এবং চূড়ান্ত অধিক প্রসন্নতা ও বিনয় প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি সকলের সহিতই মেলামেশা করিতেন।

মহাপ্রভু আল্লাহ্ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করিয়া বলেন–

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

"আর আপনি স্বীয় বাহুকে সেই মু'মিন ব্যক্তির জন্য অবনত করুন, যে আপনার অনুসরণ করে।" (সূরা শুয়ারা, ১১ রুকূ, ১৯ পারা।) আল্লাহ্ আরও বলেন–

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ -

"অনন্তর আল্লাহ্‌রই করুণার দরুন আপনি তাহাদের সহিত কোমল হৃদয় রহিয়াছেন। আর আপনি যদি কর্কশ ও কঠোর স্বভাবী হইতেন তবে তাহরা আপনার পার্শ্ব হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়া যাইত।" (সূরা আল ইমরান, ১৭ রুকূ, ৪ পারা)।

তৃতীয় শ্রেণী—এই শ্রেণীর দরবেশ ও আলিম বাক্যে অহংকার প্রকাশ করে এবং নিজেদের বাহাদুরী অপরকে শুনাইয়া আত্মগর্ব অনুভব করে। দরবেশগণের উন্নত অবস্থা ও অলৌকিক ক্ষমতা লাভ না করিয়াও তাহারা উহার অধিকারী হইয়াছে বলিয়া দাবী করে। এইরূপ দরবেশ ত বলিয়া থাকে– "অমুক ব্যক্তির কি গুণ আছে ? তাহার ইবাদতই-বা কতটুকু ? আমি সারা বৎসর নিরবচ্ছিন্ন রোযা রাখি, সমস্ত রাত্রি জাগ্রত থাকিয়া নামায পড়ি এবং প্রত্যহ কুরআন শরীফ খতম করি। আর যে ব্যক্তি আমাকে কষ্ট দেয়, সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। অমুক ব্যক্তি আমাকে কষ্ট দিয়াছিল। তাহার ধন ও সন্তান-সন্ততি সর্বস্ব বিনাশ হইয়াছে।" এই শ্রেণীর দরবেশগণ ঝগড়া-বিবাদ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। অপর লোককে তাহাজ্জুদ নামায পড়িতে দেখিলে তাহারা এত দীর্ঘ নামায পড়ে যাহাতে অন্য লোকেরা অপারগ হইয়া হার মানিয়া যায়। এইরূপ অহংকারী দরবেশগণ রোযা রাখিলে ইফতারের সময় হওয়া সত্ত্বেও আহারে অযথা বহু বিলম্ব করিয়া থাকে।

তদ্রূপ অহংকারী আলিম বলিয়া থাকে– "আমি এত বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছি যে, অমুক ব্যক্তি আমার তুলনায় কিছুই জানে না। সে ত কত নগণ্য। তাহার উস্তাদ-বা কি জানে ?" এমন অহংকারী আলিম নিজের মত ভুল হইলেও প্রতিপক্ষকে তর্কযুদ্ধ পরাজিত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করে। দুর্বল ও ছন্দময় বাক্য শ্রোতৃমণ্ডলীকে শুনাইয়া বক্তৃতাবলে অপর লোকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভের নিমিত্ত তাহারা দিবারাত্রি ব্যতিব্যস্ত থাকে। কখন কখন তাহারা আবার বিরল ও অপ্রচলিত আভিধানিক শব্দ ও হাদীস-বাক্য মুখস্থ করিয়া লয়, যাহাতে লোকসমক্ষে নিজেদের উৎকর্ষ ও অপরের জ্ঞানের স্বল্পতা প্রকাশ করিতে পারে। বর্তমানকালে কোন্ আলিম আর কোন্ দরবেশ একেবারে অহংকারশূণ্য ? অল্প-বিস্তর সকলের মধ্যে অহংকার রহিয়াছে।

রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন– "যাহার হৃদয়ে রেণু পরিমাণ অহংকার থাকিবে তাহার জন্য বেহেশ্‌ত হারাম।" যে ব্যক্তি এই হাদীস-বাক্য বিশ্বাস করিয়াছে, সে সর্বদা ভয়ে ভীত, ব্যথিত ও অহংকার হইতে বিরত থাকিবে। আর তখন সে আল্লাহ্‌র এই বাণীও সুন্দররূপে বুঝিতে পারিবে, আল্লাহ্ বলেন– "হে মানব, তুমি তোমার দৃষ্টিতে হেয় হইলে আমার নিকট প্রচুর সম্মান পাইবে। আর তুমি নিজকে সম্মানী বলিয়া মনে করিলে আমার নিকট নিতান্ত তুচ্ছ হইবে।" যাহার ধর্ম সম্বন্ধে এতটুকু জ্ঞান নাই তাহাকে আলিম না বলিয়া জাহিল (মূর্খ) বলাই সঙ্গত।

অহংকারের তৃতীয় কারণ—কৌলিন্য। উচ্চ বংশসম্ভূত বলিয়া লোকে অহংকার করিয়া থাকে। উচ্চ ও সম্ভ্রান্ত বংশের লোকেরা অপর পরহেযাগার ও আলিম

ব্যক্তিগণকেও নিজেদের দাসানুদাস বলিয়া মনে করে। তাহারা অহংকার বাহিরে প্রকাশ না করিলেও ইহা তাহাদের অন্তরে লুক্কায়িত থাকে। ক্রোধের সময় তাহারা অপ্রকৃতিস্থ হইয়া পড়ে এবং তখন বাক্যে ও কার্যে তাহাদের অহংকার প্রকাশ পাইয়া থাকে। এমতাবস্থায়, তাহারা অপরকে সম্বোধন করিয়া বলে– "কোন সাহসে তুমি আমার সহিত কথা বলিতে আসিলে ? তোমার অবস্থা সম্বন্ধে কি তুমি অবগত নও ?" অহংকারের বশবর্তী হইয়া তাহারা অপর লোককে এবং বিধ আরও বহু কথা বলিয়া থাকে। হযরত আবু যর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন– "একদা এক ব্যক্তির সহিত ঝগড়াকালে আমি তাহাকে বলিলাম– "হে হাব্‌শী সন্তান!" (ইহা শুনিয়া) রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন– 'হে আবু যর, অপ্রকৃতিস্থ হইও না, কেননা কৃষ্ণাঙ্গের উপর গৌরাঙ্গের কোন ফযীলত (মাহাত্ম্য) নাই।" হযরত আবু যর রাযিআল্লাহু আন্‌হু বলেন– '(ইহা শুনিয়া) আমি ভূতলশায়ী হইলাম এবং যাহার সহিত আমি ঝগড়া করিয়াছিলাম তাহাকে বলিলাম – 'তোমার পাখানি আমার মুখের উপর স্থাপন কর।"

প্রিয় পাঠক, অনুধাবন কর, তাঁহার বাক্য অহংকারসূচক ছিল বুঝিতে পারিয়া ইহা বিনাশের নিমিত্ত তিনি কতটুকু বিনয়াবনত হইয়াছিলেন।

দুইজন লোক একদা রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সম্মুখে গর্ব করিতেছিল। একজন অপর জনকে বলিল– "আমি অমুকের পুত্র অমুক, তুমি কে?" ইহা শুনিয়া হযরত (সা) বলিলেন– "ঠিক এমনভাবে হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের সম্মুখে দুই ব্যক্তি গর্ব করিয়াছিল। তাহাদের একজন বলিল– 'আমি অমুকের পুত্র অমুক।' এইরূপে সে তাহারা কালের ঊর্ধ্বতন নয় পুরুষের নাম উল্লেখ করিল। হযরত মূসা আলায়হিস সাল্লামের উপর ওহী অবতীর্ণ হইল –"ঐ ব্যক্তিকে বলিয়া দাও, উক্ত নয় জন দোযখে গিয়াছে এবং তুমি তাহাদের দশম ব্যক্তি।" রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন– "যাহারা দোযখের অগ্নিতে জ্বলিয়া কয়লা হইয়াছে, তাহাদিগকে লইয়া গৌরব করিও না। অন্যথায় আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে তোমরা মানুষের মলমূত্র আঘ্রাণ ও আস্বাদনকারী বিষ্ঠাপোকা অপেক্ষা মন্দ হইয়া পড়িবে।"

অহংকারের চতুর্থ কারণ—সৌন্দর্য। সৌন্দর্যজনিত অহংকার সাধারণত স্ত্রীলোকদের মধ্যেই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। হযরত আয়েশা রাযিআল্লাহু আন্‌হা এক মহিলাকে খর্ব বলিয়া উল্লেখ করিলেন। রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইহা শুনিয়া বলিলেন– "তুমি গীবত করিলে।" এই উক্তিতে স্বীয় অঙ্গসৌষ্ঠব লইয়া অহংকার করা হইয়াছিল; কেননা তিনি খর্ব হইলে অপরকে খর্ব বলিতেন না।

অহংকারের পঞ্চম কারণ—ধন। ধনীলোক অপর লোককে বলিয়া থাকে– "আমার ধন-সম্পদ কত অধিক। অমুক ব্যক্তি কত নিঃসম্বল ও কপর্দকহীন। আমি

ইচ্ছা করিলে তাহার মত বহু দাস খরিদ করিয়া রাখিতে পারি।" ধনীগণ এবং বিধ আরও বহু উক্তি করিয়া থাকে। কুরআন শরীফে সূরা কাহাফে দুই ভ্রাতার ঘটনা বর্ণিত আছে। তাহাদের একজন অপরজনকে বলিয়াছিল–

اَنَا اَكْثَرُ مِنْكَ مَالاً وَّ اَعَزُّ نَفَرًا

"ধনবলে তোমা অপেক্ষা আমি শ্রেষ্ঠ এবং জনবলে অধিক গৌরবান্বিত।" (সূরা কাহাফ, ৫ রুকূ, ১৫ পারা)। ইহাও এই শ্রেণীর অহংকারই ছিল।

অহংকারের ষষ্ঠ কারণ—দৈহিক বল। দৈহিক বলে বলীয়ান ব্যক্তিগণ অপর দুর্বল লোকের নিকট অহংকার করিয়া থাকে।

অহংকারের সপ্তম কারণ—প্রভুত্ব। যাহার অধীনে বহু লোক থাকে, যেমন শিষ্য, কর্মচারী, চাকর, দাস-দাসী ইত্যাদি, সেই ব্যক্তি আজ্ঞাধীন লোকের বাহুল্য লইয়া অংহকার করিয়া থাকে।

মোটের উপর কথা এই যে, মানুষ পদার্থকে নিয়ামত বলিয়া মনে করে, তাহা বাস্তবিকপক্ষে নিয়ামত না হইলেও ইহা অবলম্বনে সে অহংকার করে। এমনকি নপুংসকত্বের আধিক্যহেতু এক নপুংসক অপর নপুংসকের নিকট অহংকার করিয়া থাকে। উল্লিখিত সাতটিই অহংকারের কারণ।

অহংকার প্রকাশ পাওয়ার কারণ—শত্রুতা, ঈর্ষা ইত্যাদি কারণে অহংকার প্রকাশ পায়। কারণ, মানুষ কাহাকেও শত্রু বলিয়া জ্ঞান করিলে সে তৎপ্রতি কোন না কোন প্রকারের অহংকার প্রকাশ করিয়া থাকে। আবার কখন কখন রিয়ার বশবর্তী হইয়া লোকের ভক্তি পাইবার উদ্দেশ্যে তাহাদের ভক্তিভাজন ব্যক্তির প্রতিও অহংকার করা হয়। যেমন মনে কর, দুই ব্যক্তির মধ্যে তর্ক-বিতর্ক আরম্ভ হইল। একজন অপর জনকে খুব বড় জ্ঞানী ব্যক্তি বলিয়া মনে মনে ভক্তি করে, তথাপি, অপর লোকে যেন তাহাকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান না করে, তজ্জন্য ঐ ব্যক্তি তাহার প্রতি অহংকার প্রকাশ করিয়া থাকে। প্রিয় পাঠক, তুমি যখন অহংকারের কারণসমূহ অবগত হইলে তখন উহার প্রতিষেধকও তোমার জানিয়া লওয়া আবশ্যক।

অহংকাররূপ ব্যাধির প্রতিকার—প্রিয় পাঠক, জানিয়া রাখ, যে দোষ রেণু পরিমাণ থাকিলেও সৌভাগ্যের পথ ও বেহেশতের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দেয়, ইহার প্রতিকার অবশ্য কর্তব্য। কেহই অহংকাররূপ পীড়া হইতে মুক্ত নহে। ইহার প্রতিকার দ্বিবিধ। প্রথমটি সংক্ষিপ্ত ও দ্বিতীয়টি বিশিষ্ট। প্রথমটি ইলম (জ্ঞান) ও আমল (অনুষ্ঠান) এই দুইটির মিশ্রণে প্রস্তুত হয়।

অহংকারের জ্ঞানমূলক প্রতিকার—মহাপ্রভু আল্লাহ্র সম্যক পরিচয় জ্ঞানলাভ। এ কথা হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া লইতে হইবে যে, অহংকার ও শ্রেষ্ঠত্ব কেবল এক আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারও জন্য শোভা পায় না। তৎপর নিজেকেও চিনিয়া লইতে হইবে।

হৃদগতভাবে বুঝিয়া লইতে হইবে যে, নিজের ন্যায় নীচ, হীন ও অপদার্থ আর কেহই নাই। এই দ্বিবিধ উপলব্ধি জোলাপস্বরূপ হৃদয় হইতে অহংকারের জড় ও মূল উৎপাটন করিয়া ফেলে। অহংকার বিনাশের অব্যর্থ মহৌষধ সম্বন্ধে অবগত হইতে চাহিলে কুরআন শরীফের এই উক্তি যথেষ্ট–

قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَآ اَكْفَرَهُ - مِنْ اَىِّ شَىْءٍ خَلَقَهُ - مِنْ نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ
ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهُ - ثُمَّ اَمَاتَهُ فَاَقْبَرَهُ - ثُمَّ اِذَا شَآءَ اَنْشَرَهُ -

"(ইসলামে অবিশ্বাসী) মানবের উপর আল্লাহ্র বিনাশ ক্রিয়া আসুক। (কারণ) সে কত অকৃতজ্ঞ! (সে কি অনুধাবন করে না যে), আল্লাহ্ তাহাকে কিরূপ (নিকৃষ্ট) বস্তু হইতে সৃজন করিয়াছেন। শুক্র হইতে তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন; অনন্তর তাহাকে সর্বাঙ্গ সুসমঞ্জসভাবে তৈয়ার করিয়াছেন। তৎপর (মাতৃগর্ভ হইতে বহির্গমনের) পথ তাহার জন্য সুগম করিয়া দিয়াছেন। অতঃপর (ইহজীবন শেষ হইলে) তাহাকে মৃত্যু দিয়াছেন ও কবরে স্থাপন করিয়াছেন। তৎপর আল্লাহ্ যখন ইচ্ছা করিবেন তখন তাহাকে পুনরায় জীবিত করিবেন" (সূরা-আবাসা, ৩০ পারা)।

উপরিউক্ত আয়াতে মহাপ্রভু আল্লাহ্ মানুষকে স্বীয় অসীম ক্ষমতা বুঝাইয়া দিতেছেন এবং তৎসঙ্গ তাহার আদিম, অন্তিম ও মধ্যবর্তী অবস্থা বিশদভাবে বর্ণনা করিয়া দিতেছেন। তাহার আদিম অবস্থা বর্ণনা করিতে যাইয়া তিনি বলেন– مِنْ اَىِّ شَىْءٍ خَلَقَهُ "আল্লাহ্ তাহাকে কিরূপ (নিকৃষ্ট) বস্তু হইতে সৃজন করিয়াছেন।" মানুষের জানা উচিত যে, জগতে 'নাস্তি' (অবিদ্যমানতা) অপেক্ষা অধিক অপদার্থ আর কিছুই নহে। পূর্বে মানবের কোন অস্তিত্ব, নাম ও নিশানা ছিল না। আদিমকাল হইতে জন্ম মুহূর্ত পর্যন্ত সে প্রচ্ছন্নতার আবরণে লুক্কায়িত ছিল। যেমন আল্লাহ্ বলেন–

هَلْ اَتَى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُوْرًا

"মানুষের উপর এমন সময় নিশ্চয়ই আসিয়াছে যখন সে উল্লেখযোগ্য কোন বস্তুই ছিল না" (সূরা দাহর, ১ রুকু, ২৯ পারা)। অনন্তর আল্লাহ্ মৃত্তিকা সৃজন করিলেন। ইহা অপেক্ষা অধিক তুচ্ছ পদার্থ আর কি আছে ? তৎপর তিনি এক বিন্দু রক্ত ও পানি হইতে শুক্র সৃষ্টি করিলেন। ইহার পর এই শুক্র হইতে এক বিন্দু জমাট রক্ত প্রস্তুত করেন। ইহা অপেক্ষা অধিক অপবিত্র আর কোন বস্তু নাই। এইরূপে আল্লাহ্ মানুষকে 'নাস্তি' হইতে অস্তিত্বের মধ্যে আনয়ন করেন। অতএব তুচ্ছ মাটি, পুতিগন্ধময় শুক্র বিন্দু ও অপবিত্র রক্ত হইতে মানবের সৃষ্টি হইয়াছে। তৎপর সে একখণ্ড মাংসপিণ্ড ছিল। ইহার শ্রবণ শক্তি, দর্শন ক্ষমতা, বাক-শক্তি ও চলিবার ক্ষমতা কিছুই ছিল না। তখন ইহা একটি জড় পদার্থ মাত্র ছিল; তখন অপর পদার্থের বিষয় ত দূরের কথা সে নিজ সম্বন্ধেও একেবারে অজ্ঞাত ছিল।

তৎপর মহাপ্রভু আল্লাহ্‌র স্বীয় অসীম ক্ষমতায় সেই মাংস খণ্ডকে শ্রবণেন্দ্রিয়, দর্শনেন্দ্রিয়, বাক-শক্তি, বল, হস্তপদ ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রদান করিলেন। কিন্তু মৃত্তিকা, শুক্র, জমাট রক্ত এই সমস্ত মূল উপাদানসমূহে উল্লিখিত গুণাবলীর কোনটিই বিদ্যমান ছিল না। এই মূল বস্তুসমূহের কেমন আশ্চর্য কৌশলে কেমন অপূর্ব বিস্ময়কর বস্তুতে পরিণত করিয়া দিয়াছেন। ইহার প্রতি গভীরভাবে মনোনিবেশ করিলে একদিকে মহাপ্রভু আল্লাহ্‌র অসীম ক্ষমতা, অনন্ত গৌরব ও অপার শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করা যায় এবং অপরদিকে নিজের হীনতা, অপদার্থতা ও তুচ্ছতা বুঝা যায়। এমতাবস্থায়, মানুষ তখন অহংকার করিবে কিরূপে ? আদিম নাস্তির অবস্থা হইতে বর্তমান অবস্থা উপনীত হওয়া পর্যন্ত সে স্বীয় অঙ্গসৌষ্ঠবের কোন কিছুই নিজ চেষ্টায় করিয়া লইতে পারে নাই, যেজন্য সে গর্বিত হইতে পারে। এইদিকে লক্ষ্য রাখিয়াই মহাপ্রভু আল্লাহ্ বলেন–

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ اِذَآ اَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُوْنَ

"আর তাঁহার নিদর্শনাবলীর মধ্যে এই যে, তিনি তোমাদিগকে মৃত্তিকা হইতে সৃজন করিয়াছেন; তৎপর তোমরা মানুষ হইয়া বিচরণ করিতে লাগিলে" (সূরা রূম, ৩ রুকূ, ২১ পারা)। অতএব সর্বাগ্রে মানুষকে চিন্তা করিয়া দেখা উচিত– তাহার কি অহংকার করিবার কোন স্থান আছে ? না তাহার সর্বদা লজ্জিত ও অবনত থাকিতে হইবে ?

প্রিয় পাঠক, মানবের জন্ম-মৃত্যুর মধ্যবর্তী অবস্থা একবার পর্যালোচনা করিয়া দেখ। মহাপ্রভু আল্লাহ্ এক নির্দিষ্টকালের জন্য তাহাকে এ নশ্বর জগতে আনয়ন করিয়াছেন এবং অযাচিতভাবে খাদ্যদ্রব্যাদি ও নানাবিদ সম্পদ দান করিয়াছেন। মানবের কাজ তাহার ইচ্ছার উপর ছাড়িয়া দিলে সে মহা ভুলে নিপতিত হইত এবং সে মনে করিত– 'আমি একজন।' সুতরাং তাহাকে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, পীড়া, শীত, গ্রীষ্ম, দুঃখ– যন্ত্রণা এবং আরও লক্ষ অভাব-অভিযোগ ও বিপদাপদে আবদ্ধ রাখা হইয়াছে, যেন এক মুহূর্তের জন্যও সে নিরাপদ হইতে না পারে। নিমিষের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে, অথবা অন্ধ, রোগাক্রান্ত বা পাগল হইয়া যাইতে পারে। ক্ষুধাতৃষ্ণায় তাহার জীবনলীলা সাঙ্গ হইয়া যাওয়ার আশঙ্কাও আছে। এই সমুদয় অশান্তি হইতে অব্যাহতির উপায় তিনি আবার তিক্ত ঔষধে নিহিত রাখিয়াছেন। স্বাস্থ্য লাভ করিতে হইলে তিক্ত ও বিস্বাদ ঔষধ সেবনের কষ্ট তাহাকে অবশ্যই সহ্য করিতে হইবে। অপরপক্ষে, মানবের অনিষ্ট তিনি আপাতমধুর প্রলোভনের মধ্যে লুক্কায়িত রাখিয়াছেন। ইহাতে ভুলিয়া ক্ষণিক আনন্দ লাভ করিলে পরিণামে তাহাকে অসীম যাতনা ভোগ করিতে হইবে। সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনভাবে কার্য করিবার ক্ষমতা মানুষকে অর্পণ করা হয় নাই। এমনকি, সে যাহা জানিতে ইচ্ছা করে তাহাই সে জানিতে পারে

না এবং যাহা সে ভুলিতে চায় তাহাই সে ভুলিতে পারে না; যে কথা সে চিন্তা করিতে চায় না, তাহাই তাহাকে তন্ময় করিয়া ফেলে; আবার যাহা সে স্মরণ করিতে চায়, তাহা বহু দূরে সরিয়ে পড়ে। মানুষকে এইরূপ আশ্চর্য কৌশল ও অতুলনীয় সৌন্দর্য সহকারে সৃজন করা সত্ত্বেও সে সর্বাপেক্ষা অসহায় দুর্ভাগা, হীন ও দুর্বল।

মানুষের অন্তিম অবস্থা মৃত্যু। তখন এই বল, শ্রবণ-শক্তি, দর্শন-ক্ষমতা, সৌন্দর্য, শরীর এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কিছুই থাকিবে না। বরং সমস্ত অঙ্গসৌষ্ঠব শ্রীভ্রষ্ট হইয়া ঘৃণিত মৃতদেহে পরিণত হইবে এবং পচিয়া এমন বীভৎস হইয়া পড়িবে যে, ইহার দুর্গন্ধে লোকে নাসিকা বন্ধ করিবে। তৎপর ইহা নানাবিধ কীট ও পোকার উদরস্থ হইয়া ইহাদের মলমূত্ররূপে বাহির হইবে এবং পুনরায় তুচ্ছ মৃত্তিকায় পরিণত হইবে। এইরূপে মৃত্তিকায় মিশিয়া যাওয়াই মানুষের শেষ পরিণতি হইলে সে চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় উদাসীনভাবে বিচরণ করিয়া বেড়াইতে পারিত। কিন্তু এই সৌভাগ্যও তাহার অদৃষ্টে ঘটিবে না। বরং শেষ বিচারের প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান থাকিবে। তাহার চক্ষের সম্মুখে আকাশ ফাটিয়া যাইবে, গ্রহ-নক্ষত্র খসিয়া পড়িবে, চন্দ্র-সূর্য নিষ্প্রভ হইয়া যাইবে, পাহাড়-পর্বত ধোনিত তুলার মত উড়িতে থাকিবে এবং পৃথিবী রূপান্তরিত হইয়া যাইবে। ফেরেশতাগণ ফাঁদ বিস্তার করিবে এবং দোযখ উচ্ছলিত হইয়া গর্জন করিতে থাকিবে। ফেরেশ্‌তাগণ প্রত্যেক নরনারীর হস্তে আমলনামা (জীবনের কার্য-তালিকা) প্রদান করিবে। ইহাতে স্বীয় জীবনে অনুষ্ঠিত প্রতিটি অপকর্ম সে লিপিবদ্ধ দেখিতে পাইবে। এক একটি আমলনামা পাঠ করা হইবে। ফেরেশ্‌তাগণ তাহাকে বলিবে– "উত্তর দাও, তুমি এরূপ কাজ কেন করিয়াছিলে ? কেন বসিয়াছিলে ? কেন উঠিয়াছিলে ? কেন দেখিয়াছিলে ? কেন এইরূপ ধারণা করিয়াছিলে ?" এই সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে না পারিলে ফেরেশ্‌তা তাহাকে দোযখে লইয়া যাইবে। এমন সময় সেই ব্যক্তি গভীর পরিতাপের সহিত বলিবে– "হায়! আমি যদি দুনিয়াতে শূকর বা কুকুররূপে জন্ম গ্রহণ করিতাম তবে উহাদের ন্যায় মাটিতে মিশিয়া যাইতাম। এইরূপ কঠোর শাস্তি ভোগ করিতে হইত না।" অতএব যে মানুষের পরিণাম শূকর এবং কুকুর অপেক্ষাও মন্দ হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, সে কিরূপে অহংকার করিতে পারে ? গর্ব করিবার তাহার কি আছে ? ভূমণ্ডল ও গগন-মণ্ডলের প্রতিটি রেণু ও বালুকা কণা যদি তাহার বিপদে রোদন করে এবং তাহার দুর্গতিলিপি পাঠ করে তবুও ইহার অন্ত হইবে না।

প্রিয় পাঠক, তুমি কি এমন কোন কয়েদী দেখিয়াছ যে, রাজকীয় আদেশে কারাগারে আবদ্ধ রহিয়াছে, বিচারান্তে যাহার ফাঁসি হইতে পারে, অথচ সে গর্ব ও অহংকারে প্রবৃত্ত থাকে ? জগতবাসী তদ্রূপ সংসাররূপ কারাগারে মহাপ্রভু আল্লাহ্‌র আদেশে আবদ্ধ রহিয়াছে। তাহার পাপ ও অপরাধ অসংখ্য অগণিত। বিচারান্তে মহাপ্রভু আল্লাহ্ তাহার প্রতি কি আদেশ দিবেন, তাহাও জানা নাই। এমতাবস্থায়,

যথায় কঠিন বিপদ ও অসীম যাতনার সম্ভাবনা আছে, তথায় কিরূপে গর্ব ও অহংকার করা যাইতে পারে ? অতএব এই কথাগুলি হৃদগতভাবে বুঝিয়া লইলে ইহাই অহংকার বিদূরণে জোলাপের ন্যায় কাজ করিবে। এই উপলব্ধি মানবের মন হইতে অহংকারের মূল কর্তন করিয়া দিবে। তখন সে কাহাকেও নিজ অপেক্ষা হীন বলিয়া মনে করিবে না এবং বলিতে পারিবে। "হায়! আমি যদি মাটি, জড় পদার্থ বা কোন জন্তু হইতাম তবে পরিণামে ভীষণ ভয় হইতে পরিত্রাণ পাইতাম।"

অহংকারের অনুষ্ঠানমূলক প্রতিকার—সর্বাবস্থায় ও বাক্যে বিনয়ী ও নম্র লোকদের পথে অবলম্বন করা; যে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আহারের সময় হেলান দিয়া বসিতেন না এবং বলিতেন- "আমি একজন দাস। অতএব আমার পক্ষে দাসের ন্যায় আহার করা উচিত।" লোকে হযরত সুলায়মান আলায়হিস সালামকে জিজ্ঞাসা করিল- "আপনি নতুন পোশাক পরিধান করেন না কেন ?" উত্তরে বলিলেন- "স্বাধীন হইতে পারিলে পরকালে নতুন বস্ত্র পরিধান করিব।"

প্রিয় পাঠক, জানিয়া রাখ, বিনয় নামাযের অন্যতম গূঢ় উদ্দেশ্য। রুকূ ও সিজদায় ইহা প্রকাশ পায়। মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে মুখমণ্ডল সর্বাপেক্ষা মর্যাদাসম্পন্ন। সিজদার সময় সে উহা দুনিয়ার সর্বাপেক্ষা তুচ্ছ পদার্থ মাটিতে স্থাপন করে। এইজন্যই আরব জাতি এত অহংকারী ছিল যে, তাহারা কাহারও সম্মুখে মস্তক অবনত করা ত দূরের কথা, স্বীয় পৃষ্ঠও অবনত করিত না। যাহাই হউক, অহংকার যাহা করিতে আদেশ করে ইহার বিপরীত কাজ করা মানুষে কর্তব্য। আকৃতি, পোশাক, বাক্য, দর্শন, উপবেশন, গাত্রোত্থান প্রভৃতি যাবতীয় গতিবিধি ও অবস্থিতিতে অহংকার প্রকাশ পাইয়া থাকে। অতএব বিশেষ যত্ন ও চেষ্টায় অহংকার দূর করা আবশ্যক যেন বিনয় ও নম্রতা মানুষের প্রকৃতিগত হইয়া গড়ে।

অহংকারীর নিদর্শন—অহংকারের নিদর্শন বিভিন্ন আকারে প্রকাশ পায়। ইহার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে ঃ (১) অহংকারী লোক একাকী কোন স্থানে যায় না। সুতরাং এইরূপ অভ্যাস পরিত্যাগ করা উচিত। হযরত আবু দারদা রাযিআল্লাহু আন্হু বলেন- "তোমার সঙ্গে যত অধিক লোক হইবে, আল্লাহ্ হইতে তুমি তত দূরবর্তী থাকিবে।" রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম লোকের সঙ্গে গমনকালে মধ্যস্থানে থাকিতেন। আবার যখন এমনও হইত যে, সকলকে অগ্রে দিয়া তিনি পশ্চাতে চলিতেন। (২) অহংকারী ব্যক্তির অপর এক নিদর্শন এই যে, লোককে তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান করিয়া রাখিতে সে ভালবাসে এবং সে উপস্থিত হইলে লোকেরা যেন দাঁড়াইয়া তাহাকে সম্বর্ধনা জানায়, এইরূপ ইচ্ছা রাখে। রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সম্মানার্থ দণ্ডায়মান হওয়াকে তিনি ঘৃণা করিতেন। হযরত আলী কাররামাল্লাহু অজহাহূ বলেন- "কেহ দোযখী লোক দেখিতে চাহিলে সে যেন ঐ ব্যক্তিকে দেখে, যে নিজে বসিয়া থাকে এবং অপর লোক তাহার সম্মুখে

দাঁড়াইয়া থাকে।" (৩) অহংকারী লোক অপরের সহিত দেখা করিতে যায় না। হযরত সুফিয়ান সাওরী (র) মক্কা শরীফে উপস্থিত হইলে তাঁহার নিকট হইতে হাদীস শ্রবণের উদ্দেশ্যে হযরত ইবরাহীম আদ্‌হাম (র) তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। হযরত সুফিয়ান সাওরী (র) তদনুযায়ী হযরত ইবরাহীম আদ্‌হামের (র) নিকট গমন করিলে তিনি বলিলেন- "আপনার বিনয় পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে আপনাকে আহ্বান করিয়াছিলাম।" (৪) অহংকারী লোক দরিদ্রকে তাহার নিকট বসিতে দেয় না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন কোন দরিদ্রের হস্তে স্বীয় মুবারক হস্ত স্থাপন করিতেন তখন যে পর্যন্ত সেই ব্যক্তি স্বয়ং ছাড়িয়া না যাইত সেই পর্যন্ত তিনি তাহার হস্ত ধারণ করিয়া থাকিতেন। আর যে রোগী হইতে মানুষ দূরে সরিয়া থাকে, তিনি তাহার সহিত একত্রে আহার করিতেন। (৫) অহংকারী লোকের আর এক নিদর্শন এই যে, তাহারা স্বহস্তে নিজ গৃহে কোন কাজ করে না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সমস্ত কাজ স্বহস্তে করিতেন। ইসলাম জগতের সম্রাট হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের (র) গৃহে এক রজনীতে এক ব্যক্তি অতিথি হইয়াছিলেন। তৈল নিঃশেষ হওয়াতে প্রদীপ নির্বাপ হইবার উপক্রম হইল। অতিথি তখন তেল আনিবার জন্য গাত্রোত্থান করিতে চাহিলে তিনি বলিলেন- "অতিথি দ্বারা কোন কার্য করাইয়া লওয়া মনুষ্যত্ব বিরুদ্ধ।" অতিথি নিবেদন করিল- "হে ইসলাম জগতের সম্রাট, এইরূপ কাজ আপনি নিজে করেন?" তিনি বলিলেন- "হাঁ, কাজ করিবার পূর্বে আমি যে উমর ছিলাম, কাজ করার পরও আমি সেই উমরই আছি।" (৬) অহংকারী লোকের অপর এক চিহ্ন এই যে, তাহারা নিজেদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি খরিদ করিয়া বাজার হইতে নিজেরা বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারে না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বাজার হইতে একটি দ্রব্য খরিদ করিলেন। এক ব্যক্তি ইহা বহন করিয়া তাঁহার গৃহে পৌঁছাইয়া দিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলে হযরত (সা) বলিলেন- "না, যাহারা জিনিস তাহার পক্ষেই ইহা বহন করা উত্তম।" হযরত আবু হুরায়রা রাযিআল্লাহু আন্হু লাক্‌ড়ির বোঝা পৃষ্ঠে লইয়া বাজারে বিক্রয় করিতে যাইতেন এবং সঙ্কীর্ণ পথে লোকেরা ভিড় দেখিলে বলিতেন- "তোমাদের আমীরকে একটু পথ দাও।" ইহা তৎকালের ঘটনা যখন তিনি শাসনকর্তার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। খলীফার পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পরও হযরত উমর রাযিআল্লাহু আন্হু গোশ্‌ত বিক্রয়পূর্বক জীবিকা নির্বাহ করিতেন। বাজারে গমনের সময় তাঁহার এক হস্তে গোশতের ঝুড়ি অপর হস্তে দুর্রা (শাসন দণ্ড) থাকিত। (৭) অহংকারীদের অপর এক চিহ্ন এই যে, তাহারা উৎকৃষ্ট বস্ত্র পরিধান না করিয়া বহির্গত হইতে পারে না। ইসলাম জগতের একচ্ছত্র সম্রাট হযরত উমর রাযিআল্লাহু আন্হু একটি চৌদ্দ তালিযুক্ত চাদর পরিধানপূর্বক একটি দুর্রা হস্তে বহির্গত হইতেন। বস্ত্র খণ্ডের অভাবে কোন কোন তালি আবার পুরাতন চর্মের থাকিত। হযরত আলী রাযিআল্লাহু আন্হু সর্বদা অপ্রশস্ত বস্ত্র পরিধান করিতেন এবং বলিতেন- "এইরূপ পরিচ্ছদে মন বিনয়ী

থাকে, অপর লোক অনুবর্তী হয় এবং দরিদ্রগণ আনন্দিত হয়।" হযরত তউস রাহ্মাতুল্লাহি আলায়হি বলেন– "আমি নবধৌত পরিচ্ছন্ন বস্ত্র পরিধান করিলে যতক্ষণ পর্যন্ত ইহা মলিন না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত আমার মন পূর্ব অবস্থায় ফিরিয়া আসে না।" অর্থাৎ উৎকৃষ্ট বস্ত্র পরিধানে তিনি অহংকার উপলব্ধি করিতেন। খলীফার পদে অধিষ্ঠিত হইবার পূর্বে সহস্র স্বর্ণ-মুদ্রা মূল্যের বস্ত্র আনিয়া দিলে হযরত উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র) ইহা দেখিয়া বলিতেন– "ইহা ভাল বটে; তবে ইহা অপেক্ষা কোমল বস্ত্রের আবশ্যক।" কিন্তু খলীফার পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর তাঁহার জন্য পাঁচ রৌপ্য মুদ্রা মূল্যের বস্ত্র খরিদ করিয়া আনিলে তিনি বলিতেন– "ইহা ত অতি উৎকৃষ্ট; কিন্তু ইহা অপেক্ষা মোটা বস্ত্রের আবশ্যক।" লোক এই পরিবর্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন– "মহাপ্রভু আল্লাহ্ আমাকে এমন এক প্রবৃত্তি দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন যে সে নিত্য নতুন সুখ-ভোগে লালায়িত; একবার যে সুখ সে ভোগ করিয়াছে দ্বিতীয়বার ইহা ভোগ করিতে চায় না। আমার প্রবৃত্তি খলীফা পদের সুখ ভোগ করিয়াছে। ইহা অপেক্ষা অধিক সুখের দুনিয়াতে আর কিছুই নাই। এখন সে চিরস্থায়ী রাজত্বের সুখ ভোগের জন্য লোলুপ এবং ইহার অন্বেষণেই সে ব্যাপৃত রহিয়াছে।"

সর্বস্থানে উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ অহংকার পরিচায়ক নহে—প্রিয় পাঠক, সর্বস্থানে উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ অহংকার পরিচায়ক বলিয়া মনে করিও না। কারণ, উৎকৃষ্ট জিনিস পছন্দ করাই মানুষের স্বভাব। কেহ যদি নির্জনে একাকী অবস্থানকালেও উত্তম বস্ত্র পরিধান করিতে ভালবাসে তবে ইহাকে অহংকারের নিদর্শন বলা যাইবে না। আবার কেহ কেহ পুরাতন ছিন্ন বস্ত্র পরিধানপূর্বক অহংকার করিয়া থাকে। কারণ, তদ্রূপ বস্ত্র পরিধান করিয়া তাহারা নিজদিগকে পরহেযগার সংসার বিরাগী বলিয়া পরিচয় দেয়। অতএব যাহারা বিনয় ও নম্রতা শিক্ষা করিতে চায় তাহাদের পক্ষে রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জীবনচরিত্র অধ্যয়ন ও তাঁহার অনুসরণ করা আবশ্যক।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আচার-ব্যবহার– আবূ সাঈদ খুদরী রাযিআল্লাহু আন্হু হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্বহস্তে পশুকে আহার দিতেন, উট বাঁধিতেন এবং ছিন্ন বস্ত্রে তালি লাগাইতেন। তিনি পরিচারকের সহিত একত্রে আহার করিতেন; ভৃত্য আটা পিশিতে পিশিতে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলে তাহাকে সাহায্য করিতেন। বাজার হইতে সওদাপত্র খরিদ করত নিজেই বহন করিয়া আনিতেন। ধনী-দরিদ্র, ছোট-বড় সকলকেই তিনি সর্বাগ্রে সালাম দিতেন এবং সকলের সহিতই মুসাফাহ (করমর্দন) করিতেন; ধর্ম কার্যে ছোট-বড়, গোলাম-প্রভুর মধ্যে কোন পার্থক্য করিতেন না এবং দিবারাত্র একই প্রকার পোশাক পরিধান করিতেন। নিমন্ত্রণ করিলে নিতান্ত দরিদ্রের গৃহেও তিনি গমন করিতেন এবং সামান্য খাদ্য-সামগ্রী সম্মুখে

উপস্থিত দেখিলেও তিনি ইহার প্রতি অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখিতেন না। রাত্রির খাদ্য-সামগ্রী সকালের জন্য এবং সকালের খাদ্য-সামগ্রী রাত্রির জন্য রাখিতেন না। হযরত (সা) অত্যন্ত সু-স্বভাবী, নিতান্ত দানশীল ছিলেন। বন্ধুতার সহিত প্রসন্ন বদনে সকলের সহিত মিলিবার মিশিবার আগ্রহ তাঁহার আচরণে স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইত। তিনি মৃদু হাসিতেন, কখনও উচ্চ হাস্য করেন নাই। অপরের দুঃখ দর্শনে ভ্রূ কঞ্চিত না করিয়া তিনি আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করিতেন। তিনি অপার বিনয় প্রদর্শন করিতেন। অথচ ইহাতে নীচতা থাকিত না। তিনি অত্যন্ত প্রভাব ও প্রতাপশালী ছিলেন; কিন্তু তাঁহার ব্যবহারে কাঠিন্য বা কর্কশ ভাব প্রকাশ পাইত না। তিনি নিতান্ত দানশীল ও দয়ালু ছিলেন; কিন্তু তিনি অপব্যয় করিতেন না। তাঁহার হৃদয় অত্যন্ত কোমল ছিল; সকলের উপরই তিনি করুণা ও দয়া বিতরণ করিতেন। তাঁহার শরম ও লজ্জা অধিক ছিল বলিয়া তিনি মাথা নোয়াইয়া রাখিতেন। তিনি কাহারও প্রত্যাশী ছিলেন না। অতএব যাহারা সৌভাগ্য লাভের আশা করে তাহারা যেন রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের অনুকরণ ও অনুসরণ করে। তাঁহার উত্তম স্বভাবের দরুনই মহাপ্রভু আল্লাহ্ প্রশংসা করিয়া বলেন– اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ "নিশ্চয়ই আপনি অতি মহান চরিত্রের অধিকারী।" (সূরা কলম, ১ রুকূ, ২৯ পারা)।

অহংকারের বিশিষ্ট প্রতিকার

উচ্চ বংশজনিত অহংকারের প্রতিকার—কি কারণে হৃদয়ে অহংকার আসে তৎপ্রতি মনোনিবেশ করিয়া দেখিবে। বংশমর্যাদার শ্রেষ্ঠতা অবলম্বনে যদি অহংকার আসিয়া থাকে তবে তোমার জন্মের আদিম অবস্থার কথা স্মরণ কর। মহাপ্রভু আল্লাহ্ বলেন–

وَبَدَاَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ ـ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهٗ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ ـ

"আর মাটি দ্বারা তিনি মানুষের সৃষ্টি আরম্ভ করিয়াছেন; তৎপর হীন পানি-নিঃসৃত শুক্র হইতে তাহার বংশ চালাইয়াছেন।" (সূরা সিজদা, ১ রুকূ, ২১ পারা)। অর্থাৎ তোমার সৃষ্টির মূল বস্তু মাটি এবং তৎপর শুক্র দ্বারা তোমার বংশ বিস্তার লাভ করিয়াছে। অতএব শুক্র হইল তোমার পিতা আর মাটি, পিতামহ। এই উভয় বস্তু অপেক্ষা নিকৃষ্ট আর কি আছে ? আর তুমি যদি বল যে, একজন পিতাও ত আছেন, তবে দেখ, তোমার ও তোমার পিতার মধ্যবর্তী স্থলে শুক্র, জমাট রক্ত, ঘৃণিত গোশতের টুকরা ইত্যাদি বহু অপবিত্রতা বিদ্যমান রহিয়াছে। সেই সকল বিষয় তুমি বিবেচনা করিয়া দেখ না কেন? বড়ই আশ্চর্যের বিষয় যে, কাহারও পিতা ক্ষৌরকার বা মেথর হইলে তুমি ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত কর এবং বল যে, অপবিত্র পদার্থ নাড়াচাড়া করে বলিয়া সে নিজেও অপবিত্র হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু একবারও চিন্তা করিয়া দেখ না যে, তুমি নিজেই তুচ্ছ মাটি ও অপবিত্র রক্ত হইতে সৃষ্টি হইয়াছ।

তবে অহংকার কর কেন? তুমি যদি এই ব্যাপারে সম্যকরূপে অবগত হইয়া থাক তবে তোমার অবস্থা এইরূপ হইবে যে, মনে কর, এক ব্যক্তি নিজকে 'সৈয়দ' বলিয়া পরিচয় দিল। এমন সময় দুইজন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষীর সাক্ষ্যে প্রমাণিত হইল যে, সে গোলামের সন্তান বা অমুক ক্ষৌরকারের পুত্র। এমতাবস্থায়, সে কি আর বংশ লইয়া অহংকার করিতে পারিবে? অতএব তুমিও তোমার আদিম অবস্থা অবগত হইলে আর অহংকার করিতে পারিবে না। আবার দেখ, যে ব্যক্তি বংশ লইয়া অহংকার করে সে পূর্বপুরুষের গুণের জন্য অহংকার করিয়া থাকে। গুণ ত তাহার নিজস্ব হওয়া উচিত। কারণ, মানুষের মূত্র হইতে যে কীট জন্মে, ইহা কোনক্রমেই অশ্বের মূত্রজাত কীট হইতে শ্রেষ্ঠ হইতে পারে না।

সৌন্দর্যজনিত অহংকারের প্রতিকার—শারীরিক সৌন্দর্যের কারণেও মানব-হৃদয়ে অহংকার জন্মিয়া থাকে। এমতাবস্থায়, তাহাকে নিজের প্রতি দৃষ্টিপাত করা উচিত। তাহা হইলে সে স্বীয় কদর্যতা বুঝিতে পারিবে। চিন্তা করিয়া দেখ, মানুষের পেট, মূত্রথলি, রগ, নাসিকা, কর্ণ ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেমন জঘন্য মলমূত্র ও অপবিত্রতায় পরিপূর্ণ রহিয়াছে। যে মলমূত্রের ঘ্রাণ লওয়া, এমনকি, উহার প্রতি দৃষ্টিপাত করাও মানবের পক্ষে অসহনীয় হইয়া উঠে, তাহাই সে প্রত্যহ দুইবার নিজ হস্তে পরিষ্কার করিতেছে এবং উহার বোঝা সে দিবারাত্র বহন করিয়া যাইতেছে। আরও ভাবিয়া দেখ, ঋতুর রক্ত ও শুক্র হইতে মানুষের জন্ম হইয়াছে। এই উভয় পদার্থই আবার অপবিত্র মূত্রনালীর ভিতর দিয়া বাহির হয়। হযরত তউস (র) এক ব্যক্তিকে ঠাট-ঠমকের সহিত মনোরম গতিতে চলিতে দেখিয়া বলিলেন– "যে সকল ঘৃণিত ও অপবিত্র পদার্থ পেটে রাখিয়া বহন করা হইতেছে, ইহা যে ব্যক্তি অবগত আছে, সে কখনও এইরূপ পদ বিক্ষেপে চলিতে পারে না।" মানুষ যদি মাত্র একদিন মলমূত্র পরিত্যাগ করত নিজকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন না রাখিত তবে সে আবর্জনার স্তূপ ও পায়খানা অপেক্ষা অধিক বীভৎস হইয়া পড়িত। কারণ যে সকল ঘৃণিত বস্তু সে উদরে বহন করিয়া চলে এবং যাহা তাহার পেট হইতে নির্গত হয়, উহা অপেক্ষা অপবিত্র বস্তু আবর্জনার স্তূপ ও পায়খানাতে পতিত হয় না। অপরপক্ষে, সৌন্দর্য কাহারও নিজের অর্জিত নহে যে, ইহা লইয়া সে অহংকার করিবে। আবার মানবের শারীরিক কদর্যতার জন্য সে নিজে দায়ী নহে যে, তজ্জন্য তাহার দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা যাইতে পারে। আবার দেখ, মানুষের সৌন্দর্য ও সুন্দর আকৃতি চিরস্থায়ী নহে। কারণ, সামান্য পীড়াতেই সমস্ত সৌন্দর্য বিনষ্ট হইয়া যাইতে পারে। পীড়ার মধ্যে বসন্ত মানুষকে সর্বাধিক কদাকার করিয়া ফেলে। সুতরাং ক্ষণভঙ্গুর শারীরিক সৌন্দর্য লইয়া অহংকার করা শোভা পায় না।

দৈহিক বলজনিত অহংকারের প্রতিকার– অহংকারের কারণ যদি দৈহিক বল হইয়া থাকে তবে ভাবিয়া দেখ, সামান্য একটি শিরায় বেদনা হইলে মানুষ হতভম্ব ও

সর্বাধিক দুর্বল হইয়া পড়ে এবং তখন একটি মাছি তাহাকে বিরক্ত করিতে থাকিলেও সে ইহাকে তাড়াইতে পারে না। একটি ক্ষুদ্রতম কীট বা একটি পিপীলিকা তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিলে সে মরিয়া যাইতে পারে। পায়ে একটি কাঁটা বিঁধিলে মানুষ অচল হইয়া পড়ে। আবার দেখ, মানুষ যথেষ্ট বলবান হইলেও হাতী ও গাধার ন্যায় বলবান হইতে পারে না। ইহারা মানুষ অপেক্ষা অধিক বলবান। অতএব যে বল পশুর মধ্যেও অধিক আছে, ইহা লইয়া অহংকার করা মানবের পক্ষে কিরূপে শোভা পাইতে পারে!

ধনজনিত অহংকারের প্রতিকার—ধন-সম্পদ, দাস-দাসী, প্রভুত্ব, নেতৃত্ব ইত্যাদি কারণে অহংকার আসিলে মনে করিবে তৎসমুদয় বস্তু দেহ হইতে বাহিরে। ধন-সম্পদ চোরে লইয়া গেলে বা বাদশাহ প্রভুত্বপূর্ণ পদ হইতে অপসারিত করিলে তাহার অধিকারে ও ক্ষমতায় কিছুই থাকে না। আবার ধন-সম্পদ নিরাপদ থাকিলেও ইহা লইয়া অহংকার করিতে পার না। কারণ, বহু কাফিরেরও তোমা অপেক্ষা অধিক ধন আছে। তদ্রূপ রাজকীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকিয়াও অহংকার করা চলে না। কেননা, বহু মূর্খ ও নীচ প্রকৃতির লোকও তোমা অপেক্ষা দশগুণ উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া প্রবল প্রতাপে প্রভুত্ব করিয়া যাইতেছে। মোটের উপর, যে পদার্থ তোমার শরীরের সহীত আবদ্ধ নহে, ইহা তোমার নিজস্ব নহে। আর যাহা তোমার নিজস্ব নহে, ইহা লইয়া অহংকার করা বেহুদা ও নিরর্থক। ধন, প্রভুত্ব, নেতৃত্ব ইত্যাদি কোনটিই তোমার দেহের সহিত সংযুক্ত ও নিজস্ব নহে।

ইল্‌ম ও ইবাদতজনিত অহংকারের প্রতিকার—অহংকারের অন্যতম কারণ ইলম ও ইবাদত এবং এই শ্রেণীর অহংকার নিবারণ করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। কেননা, ইল্‌ম একটি উৎকৃষ্ট গুণবিশেষ এবং আল্লাহ্‌র নিকট ইহা অতি প্রিয়। ইল্‌ম অতি শ্রেষ্ঠ সম্পদ এবং মহাপ্রভু আল্লাহ্‌র গুণরাজির অন্যতম। আলিমের পক্ষে নিজের দিকে দৃষ্টিপাত না করা নিতান্ত দুষ্কর। কিন্তু দুইটি উপায়ে উহা সহজ হইয়া উঠে। **প্রথম**– ইহা ভালরূপে বুঝিয়া লওয়া যে, ইলমের দরুন আলিমকে অত্যন্ত কঠিনভাবে ধরপাকড় করা হইবে এবং তাহার জন্য পরকালে নিতান্ত ভয়ের কারণ রহিয়াছে। কেননা, মূর্খ লোকের বহু ত্রুটি উপেক্ষিত হইবে এবং আলিমের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ত্রুটিও নিতান্ত গুরুতর বলিয়া বিবেচিত হইবে। আর আলিমের সম্বন্ধ হাদীস শরীফে যে-সকল উক্তি আছে তৎসমুদয়ও গভীর মনোনিবেশ সহকারে হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইতে হইবে। যে আলিম স্বীয় ইল্‌ম অনুযায়ী আমল (কাজ) করে না তাহাকে আল্লাহ্‌ কুরআন শরীফে গর্দভ বলিয়াছেন; কারণ সে ভারবাহী গর্দভের ন্যায় শুধু বোঝা বহন করিয়াই চলিয়াছে। যেমন আল্লাহ্‌ বলেন–

كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا

অর্থাৎ "আমলহীন আলিম ভারবাহী গর্দভতুল্য।" তদ্রূপ আলিমকে কুকুরের সহিত তুলনা করিয়া আল্লাহ্ আবার বলেন–

كَمَثَلِ الْكَلْبِ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ

"(আমলহীন আলিম) কুকুরের ন্যায়। যদি কুকুরের উপর বোঝা চাপাইয়া দাও তবে ইহা জিহ্বা বাহির করিয়া হাঁপাইতে থাকে, আবার বোঝা না চাপাইলেও হাঁপাইতে থাকে" (সূরা আ'রাফ, ২২ রুকূ, ৯ পারা)। অর্থাৎ তদ্রূপ ব্যক্তি জ্ঞানী হউক, কি মূর্খ থাকুক, তাহার স্বভাব পরিবর্তন হয় না। কুকুর ও গর্দভ অপেক্ষা অধম জন্তু আর কি আছে ? বস্তুত, আলিম ব্যক্তি পরকালে পরিত্রাণ না পাইলে সে অধম পশু অপেক্ষাও নিকৃষ্ট। এমনকি জড় পদার্থ কঙ্কর এবং প্রস্তরও তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

উপরিউক্ত কারণেই একজন সাহাবী রাযিআল্লাহু আন্হু বলিতেন–"হায়! আমি যদি পাখি হইতাম।" অপর এক সাহাবী রাযিআল্লাহু আন্হু বলিতেন–"আহা! আমি যদি ছাগল হইতাম এবং আমাকে যবেহ্ করিয়া লোকে খাইয়া ফেলিত।" আরও এক সাহাবী রাযিআল্লাহু আন্হু বলিতেন–"হায়! আমি যদি ঘাস হইতাম।" মোটের উপর কথা এই যে, পরকালের ভয় যাহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া পড়িয়াছে সে কখনও অহংকার করিতে পারে না। এইরূপ লোক তদপেক্ষা মূর্খ ব্যক্তিকে বলে–"এ ব্যক্তি অজ্ঞ ; তাহার পাপ মার্জনীয় এবং সর্বাবস্থায় সে আমা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।" তদ্রূপ লোক নিজ অপেক্ষা বড় আলিম দেখিলে বলে–"তিনি এমন বিষয় জানেন যাহা আমি জানি না। সুতরাং তিনি আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" সেই ব্যক্তি কোন বৃদ্ধকে দেখিয়া মনে করে–"তিনি আল্লাহ্র ইবাদত আমা অপেক্ষা অধিক করিয়াছেন। অতএব তিনি আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" এমনকি পরকালের ভয়ে ভীত আলিম ব্যক্তি কোন কাফিরকে দেখিয়াও অহংকার করে না এবং বিবেচনা করে–"হয়ত এই ব্যক্তি মসুলমান হইতে পারে এবং তাহার পরিণাম উত্তম হইতে পারে। আল্লাহ্ না করুক, আমি হয়ত ঈমান হারাইয়া মরিতে পারি।" ইসলাম গ্রহণের পূর্বে হযরত উমর রাযিআল্লাহু আন্হুকে দর্শন করত বহু মুসলমানই তাহারা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছে বলিয়া অহংকার করিত। কিন্তু হযরত উমর (রা) তৎপর ইহ-পরকালের কিরূপ শ্রেষ্ঠত্ব ও সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাহা কাহারও অবিদিত নহে। সুতরাং তাহাদের ঐরূপ অহংকার আল্লাহ্র নিকট ভ্রমাত্মক ছিল। মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব পরকালের পরিত্রাণের উপর নির্ভর করে; আর পরিণাম কাহারও জানা নাই। অতএব পরিণামের ভয়ে সকলকেই ভীত-সন্ত্রস্ত থাকা উচিত। তাহা হইলে কাহারও মনে অহংকার আসিতে পারে না।

আবার ইহাও বুঝিয়া লও যে, অহংকার একমাত্র আল্লাহ্র পক্ষেই শোভা পায়। যে-ব্যক্তি শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব অবলম্বনে অহংকার করে, সে যেন উহা লইয়া মহাপ্রভু আল্লাহ্র সহিত ঝগড়ায় প্রবৃত্ত হয়। তদ্রূপ, বিরোধী শত্রুকে আল্লাহ্ ভালবাসেন না।

তিনি প্রত্যেক ব্যক্তিকেই আদেশ করিয়াছেন–"তুমি যখন নিজকে তুচ্ছ বলিয়া গণ্য করিবে তখন আমার নিকট সম্মান পাইবে।" মনে কর, কোন ব্যক্তি পরকালে পরিত্রাণ পাইবে বলিয়া জানে; তথাপি, মহাপ্রভু আল্লাহ্র উক্ত আদেশ স্মরণ রাখিয়া অহংকার করা সঙ্গত নহে। এইজন্যই প্রত্যেক নবীই বিনীত ও নম্রভাবে চলিয়াছেন। তাঁহারা ভালরূপে অবগত ছিলেন যে, অহংকার করাকে আল্লাহ্ পছন্দ করেন না।

ইবাদতজনিত অহংকারের প্রতিকার—ইবাদত করিয়া আবিদের পক্ষে আলিমের প্রতি অহংকার করা উচিত নহে। আবিদের মনে করা উচিত যে, ইলমের কল্যাণেই হয়ত আলিম পরকালে পরিত্রাণ পাইবে এবং তাহার সকল পাপ মোচন করা হইবে। রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"আবিদ অপেক্ষা আলিমের শ্রেষ্ঠত্ব এত অধিক যেমন সাহাবা অপেক্ষা আমার শ্রেষ্ঠত্ব অধিক।" যাহার অবস্থা জানা নাই এমন মূর্খ ব্যক্তিকে দেখিয়া আবিদের এইরূপ চিন্তা করা উচিত–"হয়ত এই মূর্খ ব্যক্তি আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আবিদ হইতে পারে। কিন্তু সে নিজকে প্রকাশ করে নাই। দুষ্ক্রিয়াশীল হৃদয়ে যে-সকল কুচিন্তা ও কুভাব উদয় হয়, তৎসমুদয়ই পাপ; হৃদয় দ্বারা লুক্কায়িতভাবে উহা সম্পন্ন হয় এবং প্রকাশ্য পাপ অপেক্ষা অধিক মন্দ। ইহা বিচিত্র নহে যে, আমার অজ্ঞাতসারে আমার অন্তরে এমন বহু মারাত্মক পাপ জড়িত ও ঘনীভূত হইয়া থাকিতে পারে যাহার ফলে আমার সমস্ত জীবনের ইবাদত বিনষ্ট হইয়া যাইতে পারে। অপরপক্ষে, এই ফাসিকের হৃদয়ে হয়ত এমন সদ্ভাব আছে যাহার কল্যাণে তাহার সমুদয় প্রকাশ্য পাপ ক্ষমা করা হইবে। আবার সে তওবা করত পাপ হইতে প্রত্যাবর্তন করিতে পারে এবং তাহার পরিণাম শুভ হইতে পারে। আমার হয়ত এমন পাপ হইতে পারে যাহার কারণে মৃত্যুকালে আমার ঈমান হারাইবার আশংকা থাকে।" মোটের উপর আবিদের নামও আল্লাহ্র নিকট হতভাগাদের তালিকাভুক্ত থাকা বিচিত্র নহে। এমতাবস্থায়, ইবাদত লইয়া অহংকার করা মূর্খতা মাত্র। এইজন্যই কামিল দরবেশগণ সর্বদা বিনীত ও নম্রভাবে জীবন যাপন করেন।

আত্মগর্ব ও ইহার আপদসমূহ

আত্মগর্বের অনিষ্টকারিতা—প্রিয় পাঠক, অবগত হও, আত্মগর্ব একটি জঘন্যতম মন্দ স্বভাব। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন–"তিনটি পদার্থ নিতান্ত মারাত্মক, (ইহারা হইতেছে) কৃপণতা, লোভ ও আত্মগর্ব।" লোকে হযরত আয়েশা রাযিআল্লাহু আন্হাকে জিজ্ঞাসা করিল–"মানুষ কখন দুষ্ক্রিয়াশীল হয়?" তিনি বলিলেন–"যখন সে নিজকে সৎকর্মী বলিয়া বিবেচনা করে।" নিজকে সৎকর্মী বলিয়া মনে করা আত্মগর্বের অন্তর্ভুক্ত। হযরত ইবনে মাসউদ রাযিআল্লাহু আন্হু বলেন–"দুইটি পদার্থ সর্বনাশের কারণ, (ইহারা হইতেছে) আত্মগর্ব ও নৈরাশ্য।" এইজন্য বুযুর্গগণ বলেন–"হতাশ

লোক কর্তব্য-কর্মে শিথিল হইয়া থাকে এবং আত্মগর্বী লোক মনে করে, চেষ্টা ও পরিশ্রমের আবশ্যকতা নাই।" (কারণ, তাহাদের সমস্তই তাহারা সর্বাঙ্গসুন্দর বলিয়া জ্ঞান করে।) হযরত মুতার্‌রাফ (র) বলেন–"সমস্ত রাত্রি নামাযে রত থাকিয়া প্রভাতে তজ্জন্য আত্মগর্ব প্রকাশ করা অপেক্ষা সমস্ত রজনী নিদ্রায় অতিবাহিত করত প্রাতে ভয় ও ক্ষুন্ন মনে শয্যা ত্যাগ করাকে আমি অধিক পছন্দ করি।" একদা হযরত শাববীর ইবনে মুনসুর রাহ্‌মাতুল্লাহি আলায়হি দীর্ঘকাল নামাযে ব্যাপৃত ছিলেন। এক ব্যক্তি ইহা দেখিয়া আশ্চর্যবোধ করিলে নামাযান্তে তিনি বলিলেন–"আশ্চর্যবোধ করিবার কি আছে? শয়তান দীর্ঘকাল ইবাদত করিয়াছিল; আর তাহার পরিণাম কি হইয়াছে তাহা তুমি জান।"

আত্মগর্বের জ্ঞানসমূহ—প্রিয় পাঠক, জানিয়া রাখ, আত্মগর্ব বহু আপদের আকর। ইহার প্রথম আপদই অহংকার এবং অহংকারের বশীভূত হইয়াই মানুষ নিজকে অপর লোক অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে করে। আত্মগর্বী লোক নিজের পাপ দেখিতে পায় না এবং ইহার ক্ষতিপূরণে যত্নবান হয় না। সে নিজকে সকল আপদমুক্ত মনে করে এবং তাহার মন হইতে ভয়-ভীতি অন্তর্হিত হয়। মহাপ্রভু আল্লাহ্ হইতে সে নির্ভয় হইয়া পড়ে ইবাদত করিয়া আল্লাহ্‌র নিকট হইতে ইহার প্রতিদান দাবী করে। সে আত্মপ্রশংসা করে ও নিজকে পবিত্র বলিয়া মনে করে। সে নিজের জ্ঞানকে পূর্ণ বলিয়া ভাবে এবং তজ্জন্য অন্যের নিকট কিছুই জিজ্ঞাসা করে না। স্বীয় মতের বিরুদ্ধে কেহ কিছু বলিলে তৎপ্রতি সে কর্ণপাতও করে না। তদ্রূপ, সে কাহারও উপদেশ শ্রবণ করে না; সুতরাং সে পূর্ণতা লাভে বঞ্চিত থাকে।

আত্মগর্ব ও অভিমানের পরিচয়—প্রিয় পাঠক, জানিয়া রাখ, মহাপ্রভু আল্লাহ্ যাহাকে ইলম বা ইবাদতের শক্তিরূপ কোন পরম সম্পদ দান করিয়াছেন, সেই ব্যক্তি যদি উহা উপলব্ধি করত ইহা বিনষ্ট হওয়া বা ফিরাইয়া নেওয়ার ভয়ে শঙ্কিত থকে তবে তাহাকে আত্মগর্বী বলা চলে না। আবার উক্ত সম্পদের বিনাশ ভয় অন্তরে না থাকিলেও উহাকে আল্লাহ্‌র দান বলিয়া আনন্দিত হইলে এবং নিজস্ব গুণ বলিয়া মনে না করিলে এমন ব্যক্তিকেও আত্মগর্বী বলা যায় না। কিন্তু উহাকে নিজস্ব গুণ বলিয়া আনন্দিত হওয়াকে আত্মগর্ব বলে। আবার সেই গুণের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট কোন প্রতিদান দাবী করিলে বা ইবাদতকে আল্লাহ্‌র উপযুক্ত খেদমত বলিয়া মনে করিলে ইহাকে অভিমান বলে। কাহাকেও কিছু দান করত যদি কেহ মনে করে যে, একটি বড় কাজ করিলাম, তবে ইহাকে আত্মগর্ব বলে। আর দানের সাথে কিছু প্রতিদানের আশা থাকিলে ইহাকে অভিমান বলে। রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"যে ব্যক্তি নামায পড়িয়া অভিমান করে সে নামাযের দায়িত্ব হইতে মুক্ত হয় না।" তিনি আর বলেন যে, স্বীয় দোষ-ত্রুটি স্বীকার করিয়া হাস্য করা অপেক্ষা অন্যায় করিয়াছে ভাবিয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে রোদন করা ভাল।

আত্মগর্বের প্রতিকার—প্রিয় পাঠক, জানিয়া রাখ, আত্মগর্বরূপ পীড়া একমাত্র মূর্খতা হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব, পূর্ণ জ্ঞানই ইহার অব্যর্থ মহৌষধ।

সামর্থ্যবাদের ভ্রম খণ্ডন—যে ব্যক্তি দিবারাত্র ইবাদতে ব্যাপৃত আছে তাহাকে আমরা জিজ্ঞাসা করিব–তোমার ইবাদত কি তোমার বিনা শক্তি ও সামর্থ্যে স্বতঃই তোমার উপর আসিয়া প্রকাশিত হইতেছে এবং তুমি ইহার প্রকাশ স্থল হইতেছ? অথবা, তুমি কি এই মনে করিয়া আত্মগর্ব অনুভব কর যে, তোমা হইতেই ইহা উদ্ভূত ও তোমার নিজস্ব ক্ষমতায়ই ইহা সম্পন্ন হইতেছে? উত্তরে যদি বল যে, তোমার ইবাদত কার্য অপর কাহারও দ্বারা পরিচালিত হইয়া তোমার উপর প্রকাশ পাইতেছে এবং তুমি ইহার প্রকাশ-স্থলমাত্র, তাহা হইলে তো তোমার আত্মগর্ব শোভা পায় না। কারণ, তোমার স্বাধীন প্রবর্তন-ক্ষমতায় উক্ত কার্য সম্পন্ন হয় নাই, তুমি অন্যের হস্তে আজ্ঞাধীন যন্ত্রস্বরূপ কাজ করিয়াছ মাত্র। আর যদি বল যে, কাজটি তুমি নিজেই সম্পন্ন করিয়াছ এবং তোমার স্বাধীন শক্তি ও সামর্থ্যে ইহা সম্পন্ন হইয়াছে, তবে আমরা জিজ্ঞাসা করিব–তুমি কি জান, যে সঙ্কল্প ও শক্তি দ্বারা হস্তপদাদি অঙ্গ-সঞ্চালনে কার্যটি সম্পন্ন হইয়াছে, উহা কে দান করিয়াছেন এবং কোথা হইতেইবা তুমি উহা পাইলে? ইহাতে যদি বল যে, তোমার স্বাধীন ইচ্ছার প্রভাবেই কার্য-নির্বাহ হইয়াছে তবে আমরা জিজ্ঞাসা করিব–সেই ইচ্ছা তোমার হৃদয়ে কে সৃজন করিয়া দিয়াছে, এই কার্য করিতে তোমাকে কে বাধ্য করিল? কারণ, যে ইচ্ছাশক্তি তোমার উপর চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছিল ইহাই তোমাকে তাড়না করিয়া কার্যে নিযুক্ত করিয়াছে এবং ইহার বিরুদ্ধাচরণ করা তোমার ক্ষমতা-বহির্ভূত ছিল। যে-ইচ্ছাশক্তি বলপ্রয়োগে তোমাকে কর্মে রত করিয়াছে, ইহা তোমার আজ্ঞাধীন নহে। ফল কথা এই যে, তোমার ইচ্ছা, শক্তি, হস্তপদাদি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমস্তই আল্লাহ্‌র মহাদান। উহার মধ্যে কোনটিই তোমার নিজস্ব জিনিস নহে। অতএব তোমার কাজ উত্তম বলিয়া আত্ম-গরিমা করা মূর্খতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। এমতাবস্থায়, আল্লাহ্‌র করুণা স্মরণ করিয়া তোমর বিস্মিত হওয়া উচিত যে, তিনি বহু লোককে উদাসীন রাখিয়াছেন এবং তাহাদের ইচ্ছাকে মন্দ কার্যে লিপ্ত করিয়াছেন। কিন্তু তিনি দয়া করিয়া ভাল কার্যের ইচ্ছাকে তোমার উপর চাপাইয়া দিয়াছেন এবং তাঁহার ক্রোধের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করত তোমাকে তাঁহার সন্নিধানে লইয়া যাইতেছেন।

যোগ্যতাবাদের ভ্রম খণ্ডন—বাদশাহ যদি বিনা পরিচর্যায় অযাচিতভাবে গোলামকে সম্মানসূচক পরিচ্ছদ দান করেন, তবে তাহার পক্ষে বিস্মিত হওয়া উচিত যে, ইহা পাওয়ার কোন অধিকার না থাকা সত্ত্বেও তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া দয়া করত উক্ত সম্মানসূচক পরিচ্ছদ তাহাকে দান করিলেন। কিন্তু সে গোলাম যদি বলে–বাদশাহ বিচক্ষণ ব্যক্তি; উপযুক্ততা বিচার না করিয়া তিনি পরিচ্ছদ দান করেন নাই, তবে আমরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিব–তুমি উপযুক্ততা কোথা হইতে অর্জন করিলে? আর

এই যোগ্যতাও যদি বাদশাহ্‌রই পূর্বদান হইয়া থাকে, তবে তোমার আত্ম-গরিমা করিবার স্থান কোথায় ? ইহার উদাহরণ এইরূপ–মনে কর, বাদশাহ্ তোমাকে একটি অশ্ব দান করিলেন এবং তুমি ইহাতে আত্মগর্ব কর না। তৎপর তিনি তোমাকে একজন সহিস দান করিলেন। এখন তুমি বলিতে লাগিলে–আমার অশ্ব ছিল বলিয়াই তো সহিস পাইলাম। অন্যের ছিল না বলিয়াই সে পায় নাই। এমতাবস্থায়, সহিস প্রাপ্তিকে নিজের যোগ্যতার উপর আরোপ করা অন্যায়, কেননা অশ্বটিও বাদশাহ্‌র অযাচিত দান। সুতরাং মানবের জন্য আত্মগর্বের কোন সঙ্গত কারণই নাই। অশ্ব ও সহিস উভয়টি একবারে দান করিলেও যোগ্যতার দাবী উত্থাপন করত আত্মগর্বের কোন কারণ থাকিত না। তদ্রূপ, যদি বল যে, তুমি আল্লাহ্‌কে ভালবাস বলিয়াই তিনি তোমাকে ইবাদতের শক্তি দান করিয়াছেন, তবে আমরা উত্তরে বলিব–আচ্ছা, বল তো, আল্লাহ্‌র প্রতি ভালাবাসা তোমার হৃদয়ে কে জন্মাইয়া দিল ? যদি বল– আমি তাঁহার পরিচয়-জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছি এবং তাঁহার অনন্ত সৌন্দর্য দেখিয়াছি বলিয়াই ভালবাসি। তবে আমরা আবার জিজ্ঞাসা করিব–এই পরিচয়-জ্ঞান ও দর্শন তোমাকে কে দান করিল ? ফল কথা এই যে, সমস্ত বস্তুই তাঁহার প্রদত্ত; সুতরাং যিনি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তোমার মধ্যে এই সমস্ত গুণ ও উপযুক্ততা, শক্তি ও ইচ্ছা সৃজন করিয়াছেন, তাঁহার দান স্মরণ করত কৃতজ্ঞ চিত্তে তোমার আত্মপ্রসাদ লাভ করা উচিত। কার্য-কারণ শৃঙ্খলায় তুমি কেবল মধ্যবর্তী স্থলমাত্র ; তুমি কিছুই নও। কোন কিছুই তোমা হইতে হয় না। তুমি মহাপ্রভু আল্লাহ্‌র ক্ষমতা পরিচালনের ক্ষেত্রমাত্র এবং তোমার উপর দিয়াই তাঁহার কার্য সম্পন্ন হইতেছে।

প্রশ্ন ও উত্তর—এমন স্থলে যদি কেহ বলে–আমি যখন কিছুই করি না, বরং আল্লাহ্‌ই সব কিছু করিয়া থাকেন, এমতাবস্থায়, প্রতিদানের আশা কিরূপে করা যাইতে পারে ? কেবল আমাদের স্বাধীন ক্ষমতায় সম্পন্ন স্বীকৃত কার্যের জন্যই আমরা প্রতিদান আশা করিতে পারি। প্রকৃত ও ঠিক উত্তর এই যে, তুমি মহাপ্রভু আল্লাহ্‌র ক্ষমতা পরিচালনার ক্ষেত্রমাত্র; নিরপেক্ষভাবে তুমি স্বয়ং কিছুই নও। আল্লাহ্ রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করিয়া বলেন–

وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى

অর্থাৎ "হে মুহাম্মদ (সা), যাহা আপনি করিলেন তাহা আপনি করেন নাই, বরং আল্লাহ্‌ই ইহা সম্পন্ন করিলেন।" মহাপ্রভু আল্লাহ্ জ্ঞান, শক্তি ও ইচ্ছা সৃষ্টির পর অঙ্গ-পরিচালনা সৃজন করিয়া দিয়াছেন। তোমার অঙ্গ সঞ্চালনে কার্য সম্পন্ন হইল বলিয়া তুমি মনে কর, তুমিই ইহা করিলে।

প্রিয় পাঠক, এই রহস্য নিতান্ত নিগূঢ় ও সূক্ষ্ম। তুমি এখন ইহা বুঝিতে পারিবে না। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা থাকিলে 'তাওয়াক্কুল ও তাওহীদ' নামক অধ্যায় এ বিষয়ে কিছু

আভাস দেওয়া হইবে। তবে তোমাদের বোধশক্তির অনুরূপ এস্থলে কিছু বুঝিয়া লও। ধরিয়া লও যে, কার্য তোমার স্বীয় ক্ষমতা প্রভাবেই সম্পন্ন হয়। কিন্তু কোন কার্যই শক্তি, ইচ্ছা ও জ্ঞান ব্যতিরেকে নির্বাহ হয় না এবং এই তিনটিই তোমার কার্যের কারণ বা কুঞ্জী। এই তিনটি বস্তুই আল্লাহ্ প্রদত্ত তিনটি মহাদান। উদাহরণস্বরূপ মনে কর, এক সুদৃঢ় ধনাগারে বহু ধন-সম্পদ রহিয়াছে। তোমার নিকট ইহার চাবি নাই বলিয়া তুমি ইহার কিছুই লইতে পারিতেছ না। কিন্তু খাজাঞ্চী দয়া করিয়া তোমাকে চাবিটি দিয়া দিলেন এবং তুমি ইহা দ্বারা কপাট খুলিয়া ইচ্ছামত ধন বাহির করিয়া লইলে। এমতাবস্থায়, তোমার ধন প্রাপ্তির কারণ কাহাকে বলিবে ? যিনি তোমাকে চাবি দিলেন তাঁহাকে কারণ বলিবে ? না, যে হস্ত দ্বারা তুমি ধন তুলিয়া লইলে ইহাকে ধন লাভের কারণ বলিবে ? তুমি অবশ্যই অবগত আছ যে, তিনি যখন চাবি দিলেন, তখন ধন তুলিয়া লওয়া কোন দুঃসাধ্য কাজ নহে। সুতরাং যিনি চাবি দিয়াছেন, তিনিই তোমার ধন লাভের প্রধান মূল কারণ। ফল কথা এই যে, কাজের চাবিস্বরূপ তোমার শক্তি ও ইহার সমুদয় উপকরণ একমাত্র মহাপ্রভু আল্লাহ্‌ই তোমাকে অনুগ্রহপূর্বক দান করিয়াছেন। সুতরাং তোমার প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া আশ্চর্য বোধ করা উচিত যে, তিনি ইবাদত-কার্যের চাবি তোমাকে দান করিয়াছেন এবং ফাসিক দুরাচারদিগকে ইহা হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছেন। আর অপর লোককে পাপের চাবি প্রদান করত তাহাদের জন্য ইবাদতের ধন-ভাণ্ডার বন্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। ইহা ধারণা করিও না যে, তাহাদের কোন পাপের জন্য তাহাদের প্রতি ইবাদতের ধন-ভাণ্ডার রুদ্ধ রাখা হইল, বরং যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতেই এইরূপ করা হইয়াছে। অপরপক্ষে তোমাকে যে ইবাদতের ধন-ভাণ্ডারের চাবি দেওয়া হইয়াছে, ইহা তোমার নিজস্ব কোন গুণের কারণে নহে; বরং শুধু অনুগ্রহপূর্বক তিনি তোমাকে ইহা দান করিয়াছেন। যাহাই হউক, যে ব্যক্তি একত্ববাদের গূঢ় তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে, সে কখনই আত্মগর্ব করিতে পারে না।

একেবারে নিঃস্ব নিঃসম্বল অথচ বুদ্ধিমান ব্যক্তি যদি অভিযোগ করিয়া বলে–"মহাপ্রভু আল্লাহ্ মূর্খকে ধন দান করিলেন, আর আমার মতো বুদ্ধিমানকে নির্ধন রাখিলেন।" তবে ইহাতেও আত্মগর্ব প্রকাশ পায়। এমন বুদ্ধিমানের জানা উচিত যে, বুদ্ধি সর্বোৎকৃষ্ট সম্পদ। ইহাও আল্লাহ্ প্রদত্ত এক মহাদান। আল্লাহ্ একজনকে বুদ্ধি ও ধন, উভয় উৎকৃষ্ট পদার্থ দান করত নির্বোধকে উভয় হইতে বঞ্চিত রাখিলে ন্যায়-সঙ্গত হইত না। আর অভিযোগকারী বুদ্ধিমান ব্যক্তিও বিনিময়ে ধন গ্রহণ করিতে সম্মত হইবে না। এক দরিদ্র পরম রূপবতী মহিলা কোন কদাকার মহিলাকে বিচিত্র বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিত দেখিয়া বলিতে পারে–"হে আল্লাহ্, তুমি এই কদাকার মহিলাকে যে প্রচুর ধন-দৌলত দান করিয়াছ, উহা তাহার জন্য একেবারেই শোভা পায় না।" তদ্রূপ রূপবতীকে ইহা বুঝা উচিত যে, আল্লাহ্ তাহাকে যে সৌন্দর্য দান

করিয়াছেন, তাহা ঐ কদাকার মহিলার অলঙ্কার ও ধন অপেক্ষা বহুগুণে উৎকৃষ্ট। ধন ও সৌন্দর্য একজনকে দান করিয়া অপরজনকে উভয় বস্তু হইতে বঞ্চিত রাখিলে অবিচার করা হইত। বাদশাহ্ এক ব্যক্তিকে অশ্ব ও অপরকে ভৃত্য দান করিলেন। এমতাবস্থায়, অশ্বগ্রহীতার পক্ষে এ কথা বলা সঙ্গত হইবে না যে, বাদশাহ্ তাহাকে অশ্ব ও ভৃত্য উভয়টি দিলেন না কেন ? অপরকে ভৃত্য দিলেন কেন ? এমন কথা বলা নিতান্ত মূর্খতা।

হযরত দাঊদ আলায়হিস সালাম একদা আল্লাহ্র নিকট নিবেদন করিলেন–"আমার সন্তানগণের মধ্যে কেহ না কেহ সারারাত্রি নামায পড়ে না, এমন কোন রজনী রাখে না, এইরূপ কোন দিন গত হয় না।" তখন ওহী অবতীর্ণ হইল–"হে দাঊদ, আমি তাহাদিগকে এই ক্ষমতা না দিলে কিরূপে তাহারা তদ্রূপ কাজ করিতে পারিত ? এখন ক্ষণকালের জন্য তোমাকে তোমার বিচার-বুদ্ধির উপর ছাড়িয়া দিলাম।" আল্লাহ্ যখন হযরত দাঊদ আলায়হিস সালামকে নিমিষের জন্য তাঁহার বিবেচনার উপর ছাড়িয়া দিলেন, তখন তিনি এমন ভুল করিয়া ফেলিলেন যে, তজ্জন্য তাঁহাকে চিরজীবন অনুতাপ করিতে হইল। হযরত আয়ূব আলায়হিস সালাম নিবেদন করিলেন–"হে আল্লাহ্, তুমি আমার উপর যে বিপদ অবতীর্ণ করিয়াছ, ইহা আমি অম্লানবদনে সহ্য করিয়াছি। তুমি যাহা করিতেছ, ইহাতেই আমি পরিতুষ্ট রহিয়াছি এবং একটুও অধৈর্য প্রদর্শন করি নাই।" তৎক্ষণাত তিনি গায়েবী বাণী শুনিতে পাইলেন–"হে আয়ূব, এইরূপ ধৈর্য-শক্তি তোমাকে কে দান করিল ?" ইহা শুনিয়া হযরত আয়ূব (আ) সতর্ক হইলেন এবং মস্তকে ধূলি নিক্ষেপ করত নিবেদন করিলেন–"হে আল্লাহ্, একমাত্র তোমার অনুগ্রহ ও সাহায্যেই আমি ধৈর্য ধারণ করিতে পারিয়াছি।" আল্লাহ্ বলেন–"আমার দয়া না হইলে কেহই সৎকর্মের পথ অবলম্বন করিতে পারিত না।" এই কারণেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন,–"কেহই স্বীয় কার্যের কারণে পরিত্রাণ পাইবে না।" ইহা শুনিয়া সাহাবাগণ নিবেদন করিলেন–"হে আল্লাহ্র রাসূল, আপনিও কি পাইবেন না ?" তিনি বলিলেন–"আল্লাহ্র দয়া ও অনুগ্রহ ব্যতীত আমিও পাইব না।" এইজন্যই বড় বড় সাহাবাগণ বলিতেন–"হায়! আমি যদি মাটি হইতাম বা আমার জন্মই না হইত।"

অতএব যে ব্যক্তি উপরিউক্ত বিষয়সমূহ সম্যকরূপে অবগত হইয়াছে, সে কখনও অহংকার ও আত্মগর্ব করিতে পারে না।

কৌলীন্য ও গুণজনিত আত্মগর্ব—প্রিয় পাঠক, জানিয়া রাখ, শক্তি, সৌন্দর্য ও কৌলীন্য কাহারও আয়ত্ত এবং স্বীয় চেষ্টায় অর্জিত নহে। অথচ কোন কোন লোক এত মূর্খ যে, উহা লইয়া তাহারা আত্মগর্বে মাতিয়া উঠে। ইহা নিতান্ত নির্বুদ্ধিতা। আলিম ও আবিদ স্বীয় অর্জিত ইল্ম ও অনুষ্ঠিত ইবাদত লইয়া আত্মগর্ব করিবার অবকাশ আছে বলিয়া হয়ত কল্পনা করিতে পারে। কিন্তু অনায়ত্ত ও অনর্জিত বিষয় অবলম্বনে

গর্ব করা নিরেট মূর্খতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। লোকে রাজপুরুষদের সহিত সম্বন্ধ লইয়া বৃথা গর্ব করিয়া থাকে। কিন্তু ঐ সকল রাজপুরুষ দোযখে কিরূপ শাস্তি পাইবে, ইহা যদি তাহারা দেখিতে পাইত, তবে তাহাদের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতাইবার ইচ্ছা করিত না; বরং তাহাদের সম্বন্ধ উল্লেখ করিতে নিতান্ত লজ্জাবোধ করিত। রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের বংশ অপেক্ষা সম্ভ্রান্ত বংশ আর নাই। তথাপি এই বংশ লইয়াও গর্ব করা নিরর্থক। কোন কোন লোক পবিত্র বংশজাত বলিয়া এত গর্বিত যে, তাহারা মনে করে পাপ তাহাদের কোন ক্ষতিই করিতে পারিবে না। এই শ্রেণীর লোক যথেচ্ছা পাপ করিয়া বেড়ায়। তাহারা বুঝে না যে, পূর্বপুরুষদের বিরুদ্ধাচরণ করত পাপ করিলে পূর্ব সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়া যায়। তাহাদের পূর্বপুরুষগণ বংশ সম্বন্ধকে কৌলীন্যের কারণ না জানিয়া নিজেদের পরহেযগারী ও সৎস্বভাবকে কৌলীন্যের কারণ বলিয়া মনে করিতেন। কেননা, পূর্বপুরুষদের মধ্যে এমন লোকও থাকিতে পারে যাহারা দোযখী।

রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বংশ লইয়া গর্ব করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তিনি বলেন–"সকল লোকই হযরত আদম আলায়হিস সালামের সন্তান এবং তিনি মাটি হইতে সৃজিত।" হযরত বিলাল রাযিআল্লাহু আন্হু আযান দিতে আরম্ভ করিলে কুরায়শগণ বলিত–"এই হাবশী গোলামকে এই সম্মানজনক পদ প্রদান করা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে ?" এই ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডনের নিমিত্ত আল্লাহ্ আয়াত অবতীর্ণ করিলেন–

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ

"নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক পরহেযগারগণ আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক সম্মানিত" (সূরা হুজুরাত, ২ রুকূ, ২৬ পারা।) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতি আদেশ হইল–

وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ

"আর আপনি অতি নিকট সম্বন্ধের আত্মীয়গণকে (আখিরাতের) ভয় প্রদর্শন করুন।" (সূরা শুআরা, ১১ রুকূ।) এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর তিনি হযরত ফাতিমা রাযিআল্লাহ আন্হাকে বলিলেন–"হে মুহাম্মদ তনয়া, স্বীয় পরিত্রাণের উপায় কর; (অন্যথা) কিয়ামত দিবসে আমি তোমার কোন উপকার করিতে পারিব না।" তৎপর তিনি হযরত সুফিয়া রাযিআল্লাহু আন্হাকে বলিলেন–"হে মুহাম্মদের (সা) ফুফু, নিজ ইবাদত কার্যে ব্যাপৃত থাকুন। (তাহা না হইলে কিয়ামত দিবস) আমি আপনার কোন সাহায্যই করিতে পারিব না।" হযরতের সহিত বংশগত সম্বন্ধ থাকাতে যদি পরকালে উপকার হইত, তবে তিনি স্বীয় কন্যাকে পরহেযগারীর কষ্ট হইতে মুক্তি

দিতেন যেন হযরত ফতিমা রাযিআল্লাহু আন্‌হা আনন্দ ও সুখে জীবন-যাপন করত উভয় লোকে অনন্ত সুখ লাভ করিতে পারেন। তবে ইহা সত্য যে, রাসূলুল্লাহ্‌র (সা) আত্মীয়-স্বজনগণই তাঁহার শাফা'আতের বেশী আশা করিতে পারেন। কিন্তু পাপ করত শাফা'আতের অযোগ্য না হওয়া আবশ্যক। যেমন আল্লাহ্ বলেন–

وَلَا يَشْفَعُوْنَ اِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى

"আর (আল্লাহ্) যাহাকে পছন্দ করেন, তাহাকে ব্যতীত তাঁহারা শাফা'আত (সুপারিশ) করিবেন না" (সূরা আম্বিয়া, ২ রুকূ, ১৭ পারা)।

শাফা'আতের উপর নির্ভর করত যদৃচ্ছা পাপ করিয়া যাওয়া এবং নির্ভীক থাকা এইরূপ, যেমন নিজের পিতা সুদক্ষ চিকিৎসক বলিয়া কোন রোগী ইচ্ছামত কুপথ্য সেবন করে। এইরূপ রোগীকে জানাইয়া দেওয়া উচিত যে, এমন পীড়াও আছে যাহার কোন চিকিৎসা নাই; এবং নিতান্ত সুদক্ষ চিকিৎসকের চিকিৎসাও উহার জন্য উপকারী হয় না। চিকিৎসকের পক্ষে উপসর্গ উপশম করা যেন সহজ হয়, রোগীর স্বভাব তদ্রূপ হওয়া আবশ্যক। অপরপক্ষে বাদশাহ্ যাহাকে ভালবাসেন তাহার সকল সুপারিশই তিনি গ্রহণ করিবেন ইহাও সঠিক নহে। বাদশাহ্‌র মহাশত্রুর জন্য অনুরোধ করিলে ইহা উপেক্ষিত হইয়া থাক। প্রতিটি পাপই আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি টানিয়া আনে ; কারণ, মহাপ্রভু আল্লাহ্ পাপের অন্তরালে স্বীয় অসন্তুষ্টি লুক্কায়িত রাখিয়াছেন। যে পাপকে তুমি লঘু বলিয়া মনে করিতেছ, বিচিত্র নহে যে, ইহাই আল্লাহ্‌র মহা অসন্তুষ্টির কারণ হইয়া উঠিবে। যেমন আল্লাহ্ স্বয়ং বলেন–"তোমরা যাহাকে লঘু বলিয়া মনে কর, আল্লাহ্‌র নিকট উহা অতি গুরু।" প্রত্যেক মুসলমানই শাফা'আতের আশা করে। কিন্তু বুদ্ধিমান লোক এই আশার উপর নির্ভর করিয়া নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হইতে পারে না। আর যাহার হৃদয়ে আল্লাহ্‌র ভয় বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে, সে কখনও অহংকার ও আত্মগর্ব করিতে পারে না।

দশম অধ্যায়

উদাসীনতা অজ্ঞানতাজনিত ভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতার প্রতিকার

পারলৌকিক সৌভাগ্য লাভে বঞ্চিত থাকার কারণে– প্রিয় পাঠক, জানিয়া রাখ, পারলৌকিক লাভে কেহ বঞ্চিত থাকিলে ইহাই বুঝিতে হইতে যে, সে পরকালের পথ আদৌ অবলম্বন করে নাই। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে বুঝা যাইবে যে, সে পথটি সম্বন্ধেই অজ্ঞ ছিল অথবা অবগত থাকিলেও এই পথ চলিতে পারে নাই। চলিতে না পারিবার কারণ এই যে, সে কুপ্রবৃত্তির শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল এবং ইহা হইতে সে মুক্তি পায় নাই। এইজন্যই সে অমনোযোগী ও উদাসীন ছিল; পথ ভুলিয়া গিয়াছিল বা প্রকৃত জ্ঞানের অভাবে সঠিক পথ হারাইয়া বসিয়াছিল। পথ চলিবার অক্ষমতা হইতে যে দুর্ভাগ্য ঘটে, ইহা ইতঃপূর্বে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে। অজ্ঞানতার কারণে যে দুর্ভাগ্য ঘটে, তাহাই এই অধ্যায়ে বর্ণিত হইবে।

অক্ষমতাজনিত ধর্মপথে প্রবৃত্তির প্রতিবন্ধকতা—যাহারা অক্ষমতার কারণে ধর্মপথে চলিতে না পারিয়া সৌভাগ্য বঞ্চিত রহিয়াছে, তাহাদিগকে দুর্বল পথিকের সহিত তুলনা করা চলে। চলিবার যথেষ্ট ইচ্ছা তাহাদের থাকিলেও পথ নিতান্ত দুর্গম ও বিপদসংকুল বলিয়া নিজেদের দুর্বলতার কারণে তাহারা ইহা অতিক্রম করিতে পারে না। ধর্মপথে ধন-লিপ্সা, প্রভুত্ব প্রিয়তা ও সম্মান-কামনা, ভোজন-লালসা, কামরিপু প্রভৃতি বিপদ-সঙ্কুল গিরিসংকট রহিয়াছে। ধর্মপথ-যাত্রীগণের কেহ তন্মধ্যে একটি কেহ দুইটি, কেহবা তিনটি গিরিসংকট অতিক্রম করতে পরিশ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু সবগুলি গিরিসংকট অতিক্রম না করিয়া কেহই গন্তব্য স্থানে পৌঁছাইতে পারে না।

ধর্মপথ-যাত্রীর অজ্ঞতাজনিত দুর্গতি—তিন প্রকার অজ্ঞতাবশত ধর্মপথ যাত্রীর দুর্গতি ঘটিয়া থাকে। প্রথম প্রকার অজ্ঞানতা হইল উদাসীনতা। ইহার উপমা এইরূপ– মনে কর, কোন পথিক স্বীয় গন্তব্য পথ পাইল; কিন্তু সেই পথে মাথা রাখিয়া সে ঘোর নিদ্রায় অচেতন হইয়া রহিল। সহযাত্রীদল প্রস্থান করিল। এমতাবস্থায়, কেহ তাহাকে না জাগাইলে তাহার সর্বনাশ হইবে। দ্বিতীয় প্রকার অজ্ঞানতা হইল পথভ্রান্তি। ইহার উদাহরণ এই যে, মনে কর যাহারা গন্তব্য স্থান পূর্ব দিকে সেই ব্যক্তি দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া পশ্চিম দিকে যাইতে লাগিল। এমতবস্থায়, সে যতই ধাবিত হইবে ততই অভিলাষিত স্থান হইতে দূরে সরিয়া পড়িবে। ইহাই মহা পথভ্রষ্টতা। তৃতীয় প্রকার অজ্ঞনতা হইল, ভালকে মন্দ এবং মন্দকে ভাল মনে করিয়া

ভ্রান্তিতে পতিত হওয়া। একটি উপমা দ্বারা ইহা বুঝাইয়া দেওয়া যাইতেছে। হজ্জযাত্রী জানে যে, আরবের মরুপ্রান্তরে পাথেয়স্বরূপ বিশুদ্ধ স্বর্ণের আবশ্যক। সুতরাং সে তাহার যথাসর্বস্ব বিক্রয় করত স্বর্ণে পরিণত করিয়া লইল। কিন্তু বিশুদ্ধ স্বর্ণ ভ্রমে সে কৃত্রিম ও দোষযুক্ত স্বর্ণ গ্রহণ করত ভাবিতে লাগিল যে, পাথেয় সঞ্চিত হইয়াছে এবং অনায়াসে সে গন্তব্য স্থানে পৌছিয়া যাইবে। কিন্তু আরব প্রান্তরে উপস্থিত হইয়া আবশ্যক দ্রব্যাদি ক্রয়ের জন্য যখন সে সেই মেকী স্বর্ণ বাহির করিবে, তখন ইহা গ্রহণ করা ত দুরে থাকুক, ইহার প্রতি কেহই দৃষ্টিপাতও করিবে না। তখন সেই নিঃসহায় বিদেশী পথিকের অনুতাপ ও পরিতাপের অন্ত থাকিবে না। এই প্রকার মোহাচ্ছন্ন লোকে সম্বন্ধে আল্লাহ্ বলেন, "আমি কি তোমাদিগকে এমন লোকের কথা বলিব যাহারা কার্য করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে? তাহাদের জীবনব্যাপী পরিশ্রম ব্যর্থ হইয়াছে। অথচ তাহারা মনে করিত যে, তাহারা উত্তম কার্য করিয়াছে" (সূরা কাহাফ, ১২ রুকূ, ১৬ পারা)।

ধর্মপথ-যাত্রীর কর্তব্য—উল্লিখিত হজ্জ-যাত্রীর পক্ষে সর্বাগ্রে পোদ্দারি শিক্ষা করত তৎপর পাথেয় স্বর্ণ সংগ্রহ করা উচিত ছিল। তাহা হইলে কৃত্রিম অকৃত্রিম স্বর্ণ সে চিনিয়া লইতে পারিত। নিজে পরীক্ষা করিতে না জানিলে অভিজ্ঞ স্বর্ণ-পরীক্ষক দ্বারা পরীক্ষা করাইয়া লওয়া আবশ্যক ছিল। ইহাও করিতে অক্ষম হইলে একটি কষ্টি-পাথর সংগ্রহ করিয়া লওয়া কর্তব্য ছিল। স্বর্ণ-পরীক্ষক সুনিপুণ পীর ও উস্তাদসদৃশ। সুতরাং, আল্লাহ্র নৈকট্য লাভে ইচ্ছুক প্রত্যেক ব্যক্তিকে সৎ ও অসৎ চিনিবার ক্ষমতা অর্জন করত সুদক্ষ পীরের তুল্য হওয়া আবশ্যক। ইহাতে অক্ষম হইলে কোন অভিজ্ঞ পীরের সাহচর্যে নিজে থাকিয়া তাঁহার উপদেশ অনুসারে কাজ করিতে হইবে। এই উভয়টির কোনটিই করিতে না পরিতে অন্ততপক্ষে তাহাকে কষ্টি পাথরের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। মানুষের কুপ্রবৃত্তিই এই কষ্টি-পাথর। কুপ্রবৃত্তি যাহা করিতে আদেশ করে বাতিল ও মিথ্যা জ্ঞানে ইহা একেবারে পরিত্যাগ করিবে। কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ করিতে গেলে কখন কখন ভুলভ্রান্তিও হইতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ স্থলে কার্য ঠিকভাবেই সম্পন্ন হইয়া থাকে।

অতএব মানুষের দুর্গতির মূল কারণ অজ্ঞানতা। ইহা তিন প্রকার। এই তিন প্রকার অজ্ঞানতার বিস্তৃত পরিচয় এবং দূর করিবার উপায় অবগত হওয়া সকলের পক্ষেই অবশ্য কর্তব্য। মূল কারণ, ইলম এবং ইহার দ্বিবিধ মূল সূত্র আছে। প্রথম, পথের পরিচয় লাভ ও দ্বিতীয়, পথে চলা। এই দুইটি মূল সূত্র লাভ হইলে সৌভাগ্য পাইবার আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। এই জন্যই হযরত আবু বকর রাযিআল্লাহু আন্হু সংক্ষেপে দোয়া করিতেন–

اَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَّارْزُقْنَا اِتِّبَاعَهٗ

"হে আল্লাহ্, আমাদের নিকট সত্যকে সত্যরূপে প্রতিপন্ন কর এবং তদনুসারে চলিতে আমাদিগকে ক্ষমতা দান কর।"

ইতিপূর্বে পথ-চলার অক্ষমতা দূরীকরণের উপায় বর্ণিত হইয়াছে। এখন পথ সম্বন্ধে অজ্ঞানতা দূরীকরণের উপায় বর্ণিত হইবে।

উদাসীনতা ও অজ্ঞানতা-পাশ হইতে অব্যাহতির উপায়—প্রিয়, পাঠক, অবগত হও, অধিকাংশ লোক যে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভে বঞ্চিত রহিয়াছে, উদাসীনতা ইহার একমাত্র কারণ। শতকরা নিরানব্বই জনের পক্ষে এই কথা খাটে। পরকালের ভয় হইতে উদ্বেগহীন হওয়াকে এস্থলে উদাসীনতা বলা হইয়াছে। মানব পরকালের সংকট সম্পর্কে সতর্ক থাকিলে পাপ করিতে পারিত না। কারণ, মহাপ্রভু আল্লাহ্ ইহা মানবের প্রকৃতিগত করিয়া দিয়াছেন যে, যাহাতে তাহার প্রাণনাশের আশঙ্কা রহিয়াছে সে ইহার ত্রিসীমায়ও যায় না। ইহা হইতে আত্মরক্ষা করিতে বহু দুঃখকষ্ট ভোগ করিতে হইলেও সে উহা অম্লান বদনে সহ্য করে।

মোহাচ্ছন্ন মানবজাতির পথ-প্রদর্শক—পরকালের বিপদ সামান্য জ্ঞানে বুঝা যায় না। কেবল নবীগণ নবুওয়াতের আলোকে উহা অবগত হইয়াছেন। তাঁহাদের নিকট হইতে যাঁহারা জ্ঞানালোক লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাও উহা বুঝিতে পারিয়াছেন। আবার নবীগণের স্থলাভিষিক্ত আলিমগণও উহা জানিতে পারিয়াছেন। সাধারণ লোককে উক্ত তিন শ্রেণীর লোকেরা কথায় বিশ্বাস স্থাপন করত মানিয়া লইতে হইবে। যে ব্যক্তি পথিমধ্যে ঘুম ঘোরে অচেতন রহিয়াছে কোন জাগ্রত দয়ালু বন্ধুকে তাহার নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া দিতে হইবে। ইহা ব্যতীত নিদ্রিত জনের আর উপায় নাই। মোহ-ঘুমে অচেতন মানবজাতিকে স্নেহভরে ডাকিয়া জাগ্রত করিবার উদ্দেশ্যে মহাপ্রভু আল্লাহ্ বিশ্বমাবতার পরম বন্ধু হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে জগতে প্রেরণ করেন। তাঁহার প্রতিনিধি আলিমদগণও সর্বদা মানবজাতিকে সতর্ক করিয়া আসিতেছেন। মহাপ্রভু আল্লাহ্ সকল নবীকেই এই উদ্দেশ্যে পাঠাইয়াছেন। তিনি স্বয়ং এক স্থানে এই সম্বন্ধে যাহা বলেন, ইহার ভাবার্থ এই হে মুহাম্মদ (সা), মোহ-ঘুমে অচেতন মানবজাতিকে জাগ্রত করিবার জন্য আমি আপনাকে জগতে পাঠাইয়াছি। আপনি সমস্ত লোককে জানাইয়া দেন যে, ঈমানদার ও সৎলোক ব্যতীত আর সকলেই দোযখের প্রান্তে অবস্থিত রহিয়াছে। অপর একস্থানে তিনি যাহা বলেন তাহার ভাবার্থ এই– যে ব্যক্তি দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হইয়াছে ও কুপ্রবৃত্তির আদেশ মানিয়া চলিতেছে, সে দোযখে পতিত হইয়াছে। মানুষের কুপ্রবৃত্তিসমূহ দোযখ গর্তে বিছানো পুরাতন চাটাইসদৃশ। যে ব্যক্তি এইরূপ চাটাইর উপর দিয়া চলিবে, সে অবশ্যই দোযখে যাইয়া পড়িবে। আর যে ব্যক্তি প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ করিবে, সে বেহেশতে প্রবেশ করিবে।

কুপ্রবৃত্তিসমূহ বেহেশতে গমনের পথে বিপদসঙ্কুল দুর্গম গিরিসংকট তুল্য। যে ব্যক্তি ইহা অতিক্রম করিতে পারিবে, সে নিশ্চয়ই বেহেশতে পৌঁছিবে। এজন্যই রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন– "দোযখ মরোনম কুপ্রবৃত্তি দ্বারা বেষ্টিত এবং বেহেশ্‌ত অপ্রীতিকর দুঃখ-কষ্ট দ্বারা বেষ্টিত রহিয়াছে।" মানব-বসতি হইতে বিচ্ছিন্ন বনভূমি ও পর্বতের অধিবাসীগণের মধ্যে আলিম নিতান্ত বিরল। সুতরাং তাহারা মোহ-ঘুমে অচেতন ও কর্তব্য কর্মে উদাসীন থাকে। পরকালের বিভীষিকা সম্পর্কে তো তাহারা নিজেরা অজ্ঞাত, আর তাহাদিগকে কেহ জাগ্রতও করে না। এই কারণে তাহারা ধর্মপথ হইতে বিমুখ। পল্লীবাসীদের অবস্থাও তদ্রূপ। কেননা পল্লীগ্রামেও আলিম নিতান্ত কম হইয়া থাকে। তাই পল্লীগ্রামকে কবরের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন–

اَهْلُ الْكُوْرِ اَهْلُ الْقُبُوْرِ

"পল্লীবাসী কবরে স্থাপিত লোকের তুল্য।"

খাঁটি উপদেষ্টার অভাবে মানবের দুর্গতি—যে শহরে কোন আলিম নাই বা থাকিলেও তাহারা লোকদিগকে উপদেশ দান করে না, কেবল সংসার লইয়া মত্ত থাকে এবং ধর্ম-কর্মে বিমুখ, সেই শহরের অধিবাসীগণও মোহে অচেতন থাকে। কারণ, যাহারা লোকদিগকে জাগ্রত করিবে তাহারা নিজেরাই ঘুমঘোরে অচেতন। এমতাবস্থায়, কিরূপে তাহারা অপরকে জাগাইবে? আবার যে শহরের আলিমগণ উপদেশ দানের নিমিত্ত বক্তৃতামঞ্চে দণ্ডায়মান হয়, ওয়াযের সভা অনুষ্ঠিত করে এবং বাজে ও অসার বক্তাদের ন্যায় ভাষণ দান করে, হাস্যোদ্দীপক উক্তি ও নিরর্থক সূক্ষ্ম কথা বর্ণনা করে, আর আল্লাহ্‌র রহমতের প্রতিশ্রুতি শুনাইয়া লোককে ধোঁকা দিয়া যেন বুঝাইয়া দেয় যে, তাহারা খাঁটি ইসলামের বিরুদ্ধাচরণে যে কোন রীতিনীতি অবলম্বন করুক না কে, কখনই তাহারা আল্লাহ্‌র রহমত হইতে বঞ্চিত হইবে না, তবে সেই শহরের লোকের অবস্থা মোহাচ্ছন্ন অচেতন লোকের অবস্থা অপেক্ষাও শোচনীয়। এমন লোকের দৃষ্টান্ত এইরূপ যে, মনে কর, কেহ পথিমধ্যে নিদ্রিত ব্যক্তিকে জাগাইয়া তীব্র মদিরা পান করাইল এবং ফলে সে ঘোর মাতাল হইয়া ভূতলশায়ী হইল। ইতিপূর্বে তদ্রূপ অজ্ঞ ও নিদ্রিত হতভাগা ত সকলের কথাই শুনিতে পাইত এবং অপরের আহ্বানে অনায়াসে জাগ্রত হইতে পারিত। কিন্তু এখন তাহার এই অবস্থা দাঁড়াইল যে, তাহার মাথায় পঞ্চাশ লাথি মারিলেও সে কিছুমাত্রই টের পাইবে না।

নির্বোধ লোকেরা সংসারমত্ত উক্তরূপ উপদেশকের কথা শুনিলে এমন হয় যে, পরকালের চিন্তাও তাহাদের মনে উদয় হয় না এবং পরকালের ভয় দেখাইলে তাহারা বলে– "ওহে, আল্লাহ্ নিতান্ত দয়ালু এবং অসীম অনুগ্রহকারী। আমার পাপে তাঁহার

কি ক্ষতি হইবে? তাঁহার বেহেশ্‌ত এত প্রশস্ত যে, ইহাতে আমার ন্যায় বহু পাপীর জন্য স্থানের অনটন ঘটিবে না।" এইরূপ আরও বহু অসার কল্পনা তাহাদের হৃদয়ে উদিত হয়। একমাত্র নিরেট মূর্খগণই তেমন উক্তি করিয়া থাকে। যে সকল বক্তা ঐ প্রকার বক্তৃতা দ্বারা লোকের মনে তদ্রূপ অসার কল্পনার সঞ্চার করে তাহার লোকের ধর্মভাব বিনাশের চেষ্টায় তৎপর রহিয়াছে। যে চিকিৎসক উষ্ণতাজনিত পীড়ায় মুমূর্ষু রোগীকে মধু সেবনের ব্যবস্থা দেয় এবং মনে করে যে, ইহাতে রোগের উপশম হইবে তাহার সহিত তদ্রূপ উপদেশকের তুলনা করা চলে। এই কথা জন্মে মধু কেবল তৎসমুদয়ই দূর করিতে পারে।

রহ্‌মতসূচক আয়াত ও হাদীস বিবিধ পীড়ানাশক—কুরআন শরীফের যে সকল আয়াত ও হাদীস বাণী আল্লাহ্‌র দয়া ও করুণার আশা বৃদ্ধি করে উহা অবশ্য মানসিক পীড়ার ঔষধ বটে। কিন্তু শুধু দুই প্রকার রোগী এই ঔষধে উপকার পাইয়া থাকে। **প্রথম প্রকার**—যে ব্যক্তি অতিরিক্ত পাপ করত আল্লাহ্‌র রহমত হইতে নিরাশ হইয়াছে এবং হতাশায় পাপ হইতে তওবা করিয়া সৎপথে প্রত্যাবর্তন করিতে সাহস পাইতেছে না এবং মনে করে যে, আল্লাহ্ তাহার তওবা কবুল করিবে না, এমন হতাশ লোকের পক্ষে রহমতসূচক আয়াত ও হাদীস বাণী মহৌষধ বটে। এই রহমতসূচক একখানা আয়াতের ভাবার্থ এই– আল্লাহ্ বলেন, "হে মুহাম্মদ (সা), আমার বান্দাগণকে অবহিত করুন যে, হতাশা যেন তাহাদের হৃদয়ে স্থান না পায়। তাহারা যদি তওবা করিয়া তৎপ্রতি প্রত্যাবর্তন করে এবং তাঁহার আদেশ মানিয়া চলে, তবে আল্লাহ্ সমস্ত পাপ ক্ষমা করিয়া দিয়া থাকেন।" **দ্বিতীয় প্রকার**—যাহারা আল্লাহ্‌র ভয়ে অস্থির হইয়াছে, এক মুহূর্তের জন্যও নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছে না– অনাহারে অনিদ্রায় সর্বদা কঠোর পরিশ্রম ও অসীম সাধনায় নিরবচ্ছিন্ন ইবাদত করিয়া শরীরপাত করিবার উপক্রম করিয়াছে, কিন্তু ইহাতেও সে পরিতৃপ্ত হইতে পারিতেছে না, এমন ব্যথাতুর লোকের পক্ষে রহ্‌মত প্রকাশক আয়াত শান্তিদায়ক হইয়া থাকে।

রহমতসূচক আয়াত ও হাদীস পাঠে স্থলবিশেষে ক্ষতি—পরকালের প্রতি ভয়শূণ্য লোকদিগকে করুণার বাণী শুনাইলে কাটা ঘায়ে লবণ ছিটার ন্যায় কাজ করে। অর্থাৎ তাহাদের মানসিক পীড়া অধিকতর বৃদ্ধি পায়। কোন চিকিৎসক উষ্ণতাজনিত রোগে মধু সেবনের ব্যবস্থা দিয়া যেমন রোগীর প্রাণনাশ করে এবং নিজেও অপরাধী হয়, তদ্রূপ সংসারাসক্ত ঐ প্রকার উপদেশকে আলিমও উদাসীন লোকের ধর্মজীবন বিনাশ করতে পাপী হয়। তেমন আলিম দজ্জালের সাথী ও শয়তানের পরম বন্ধু। যে স্থানে এই প্রকার আলিমের আবির্ভাব হয়, তথায় শয়তানের কোন আবশ্যকতা নাই। কারণ, তদ্রূপ আলিমই তথায় শয়তানের সুনিপূর্ণ প্রতিনিধিরূপে কাজ করিয়া থাকে। আবার যে সকল আলিম ইলম অনুযায়ী কাজ করে না, তাহাদের খাঁটি উপদেশও ধর্মের প্রতি লোকের শিথিলতা বিদূরিত হয় না।

সংসারাসক্ত উপদেশক আলিমের অবস্থা—সংসারাসক্ত উপদেশক আলিমের অবস্থা এইরূপ– মনে কর, এক ব্যক্তি সুস্বাদু 'লোযিনা' নামক লোভনীয় হালুয়া সম্মুখে রাখিয়া খাইতেছে এবং সুললিত বচনে অপর লোককে ডাকিয়া বলিতেছে– "হে লোকগণ, তোমরা ইহার ত্রিসীমানায়ও আসিও না। ইহাতে মারাত্মক বিষ মিশানো আছে।" এমতাবস্থায়, বক্তার কথা শুনিয়া লোকের মনে 'লোযিনা' ভক্ষণের লোভ অধিকতর বৃদ্ধি পাইবে। আর তাহারা মনে করিবে– "এই ব্যক্তি একাই সবগুলি ভক্ষণ করিবার অভিপ্রায়েই হয়তো অপরকে ইহার নিকটবর্তী হইতেও নিষেধ করিতেছে।"

প্রকৃত উপদেশক আলিমের পরিচয়—প্রকৃত উপদেশক আলিমের কথাও কার্য, উভয়ই পূর্বকালের বুযুর্গগণের অনুরূপ শরীয়ত-সঙ্গত হইয়া থাকে। তদ্রূপ ব্যক্তির উপদেশ শ্রবণ করিলে মোহ-মুগ্ধ অচেতন লোক জাগরিত হইবে। উপদেশককে জনপ্রিয় না হইলে সব লোক তাহার উপদেশ শুনিতে আসিবে না। এমতাবস্থায়, ধর্মপ্রাণ খাঁটি আলিমের পক্ষে যথাসাধ্য অপরের গৃহে গমন করত মধুর বচনে লোককে বুঝাইয়া তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র পথে আনয়নের চেষ্টা করা উচিত।

লোকের দূরবস্থার কারণ—উল্লিখিত বিস্তৃত বর্ণনা হইতে ইহা প্রমাণিত হইল যে, বর্তমানকালে হাজারের মধ্যে নয় শত নিরানব্বাই জন লোকই পরকালের কথা ভুলিয়া সংসারের মোহে মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে। আর মোহ এমন এক সাংঘাতিক পীড়া যে, ইহার চিকিৎসা রোগী করাইতে পারে না। কেননা, মোহাচ্ছন্ন ব্যক্তি যে মোহ-রোগে আক্রান্ত সে নিজেই ইহা জানে না। সুতরাং সে রোগের চিকিৎসা করাইবে কিরূপে ? বালক-বালিকা যেমন মাতা-পিতা বা শিক্ষকের আহ্বানে জাগরিত হয়, আবাল-বৃদ্ধবণিতা তদ্রূপ খাঁটি উপদেশক আলিমের কথা শুনিয়া সচেতন হইতে পারে। প্রকৃত আলিমের সংখ্যা জগতে দিন দিন হ্রাস পাইতেছে। এইজন্যই মোহ-পীড়া মানব সমাজ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। অপরপক্ষে, উপদেশকগণ পরকালের কথা কিছু বলিলেও তাহাদের নিজেদের হৃদয়ে পরকালের ভয় লেশমাত্রও নাই। এমন উপদেশকের কথায় সমাজের কোন উপকারই হয় না।

পথভ্রান্তি ও ইহার প্রতিকার

পরকাল সম্পর্কে ভ্রান্তির কারণ—প্রিয় পাঠক, জানিয়া রাখ, অনেক লোক পরকাল সম্পর্কে একেবারে অচেতন নহে। কিন্তু ভ্রমাত্মক ধারণার বশীভূত হইয়া তাহারা সৎপথ হারাইয়া ফেলিয়াছে এবং এই পথভ্রান্তিই তাহাদের জন্য এক বিষম পর্দা হইয়াছে। ইহা সম্যকরূপে বুঝাইবার জন্য পাঁচটি উপমা দেওয়া যাইতেছে।

প্রথম উপমা—কেহ কেহ পরকালকে একেবারে অস্বীকার করত বলে, মানুষ মরিলেই সব শেষ হইল; তাহার আর কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না। যেমন প্রদীপের

তৈল নিঃশেষ হইলেই আলো নিবিয়া ফুরাইয়া যায়, মানুষের পরিণামও তদ্রূপ। এইজন্যই তাহারা পরহেযগারী পরিত্যাগ করত আমোদ-প্রমোদে জীবন অতিবাহিত করে এবং মনে যে, নবীগণ মানবজাতির শুধু পার্থিব বিষয়াদি সংশোধনের উদ্দেশ্যে বা লোকের ভক্তি-শ্রদ্ধা আকর্ষণ করত নিজ-নিজ মতাবলম্বীর সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। পরকালে অবিশ্বাসী লোকেরা মনে করে, বালক-বালিকাদিগকে ভয় দেখাইয়া যেমন বলা হইয়া থাকে যে, তোমরা পাঠশালায় না গেলে তোমাদিগকে ইঁদুরের গর্তে পুরিয়া রাখিব, দোযখের ভয়ও তদ্রূপ অসম্ভব কল্পনামাত্র। পরকালে অবিশ্বাসীগণ যদি এই দৃষ্টান্তটিকে মনোযোগের সহিত বুঝিবার চেষ্টা করিত, তবে পরিষ্কারূপে প্রতীয়মান হইত যে, পাঠশালায় না যাওয়ার কারণে ভবিষ্যত জীবনে বালক-বালিকাগণকে যে দুর্গতি ভোগ করিতে হইবে, ইহা ইঁদুরের গর্তে প্রবেশ অপেক্ষা নিকৃষ্ট ও ভীতিপ্রদ। কারণ, যাঁহাদের জ্ঞান-চক্ষু প্রস্ফুটিত হইয়াছে, তাঁহারা জানিতে পারিয়াছেন যে, আল্লাহ্‌র দীদার হইতে বঞ্চিত থাকার যাতনা দোযখের শাস্তি অপেক্ষা ভীষণ পীড়াদায়ক। কু-প্রবৃত্তির অন্ধ অনুসরণের দরুনই পরকালে অবিশ্বাসীগণ এইরূপ উক্তি ও ভ্রমাত্মক ধারণা করিয়া থাকে এবং উহা তাহাদের স্বভাবগত হইয়া পড়ে। শেষ যমানায় বহু লোকের অন্তরে পরকালের প্রতি অবিশ্বাস প্রবল হইয়া উঠিবে। তাহারা ভাষায় কিছু ব্যক্ত না করিলেও অন্তরস্থ লুক্কায়িত তাহাদের কর্ম ও হাবভাবে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইবে। তাহাদের বুদ্ধির এমন বিভ্রাট ঘটিয়াছে যে, সংসারের ক্ষণভঙ্গুর বিপদাশঙ্কায় তাহারা সর্বদা ব্যতিব্যস্ত থাকে। কিন্তু পরকালে বিশ্বাসী হইলে পরকাল-ভীতিকে তাহারা এত লঘু বলিয়া মনে করিত না।

পরকাল-অবিশ্বাস দুরীকরণের উপায়—যাহাদের হৃদয়ে পরকালে অবিশ্বাসরূপ পীড়া প্রবেশ করিয়াছে, পরকালের নিগূঢ় তত্ত্ব জানিয়া লওয়াই ইহার একমাত্র ঔষধ। তিনটি উপায়ে পরকালের অবস্থা জানা যাইতে পারে।

প্রথম উপায়—প্রত্যক্ষ দর্শন। বেহেশ্‌ত, দোযখ এবং পরহেযগার ও পাপিষ্ঠলোকদের পরিণাম প্রত্যক্ষভাবে অন্তর্দৃষ্টিতে দেখিতে পাইলে পরকালে অবিশ্বাস বিদূরিত হয়। কিন্তু ইহা একমাত্র নবী ও ওলীগণের পক্ষেই সম্ভবপর। তাঁহারা সংসারে অবস্থানকালেও সকল পার্থিব বিষয় ও সম্পর্ক ভুলিয়া পরকালে পরকালের অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন করিতে পান। জীবিতাবস্থায় মানবের শরীর ও ইন্দ্রিয় এবং উহা হইতে উৎপন্ন সংস্কার ও আসক্তি বিজড়িত হইয়া পরকালের অবস্থা দর্শনে প্রবল বাধার সৃষ্টি করে। দর্শন-পুস্তকের চতুর্থ অধ্যায় এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইয়াছে । যাহাই হউক, নবী ও ওলীগণের ন্যায় প্রত্যক্ষ দর্শন ক্ষমতা নিতান্ত দুর্লভ। যাহারা পরকালেই অবিশ্বাসী, তাহাদিগকে প্রত্যক্ষ নিদর্শনের বিষয় বলিয়াই বা লাভ কি?

বলিলেও তাহারা উহা কিরূপে করিবে এবং চেষ্টা করিলেও তাহারা কি প্রকারে ইহা লাভ করিবে?

দ্বিতীয় উপায়—যুক্তি প্রমাণ। যুক্তি-প্রমাণাদি দ্বারা দ্বারা মানুষ আত্মা ও ইহার প্রকৃত পরিচয় লাভ করিলে বুঝিতে পারে যে, আত্মা এমন একটি অস্তিত্ব যাহা স্বয়ং বিদ্যমান। ইহা শরীরের আশ্রয় সাপেক্ষ নহে, বরং নিরপেক্ষভাবে স্বয়ং বিদ্যমান আছে; দেহ সৃজনের পূর্বেও ছিল এবং দেহ না থাকিলেও বর্তমান থাকিবে। মধ্যবর্তীকালে দেহকে সৃজন করিয়া শুধু আত্মার বাহনস্বরূপ নিযুক্ত করা হইয়াছে। আত্মার সহিত দেহের কোন সাদৃশ্য নাই। মৃত্যুর পর দেহ মাটির সহিত মিশিয়া গেলেও আত্মা পূর্বের ন্যায় স্বীয় সত্ত্বায় বিদ্যমান থাকিবে। এই প্রকার অন্তর্দৃষ্টি লাভের পন্থাও নিতান্ত দুর্গম ও কঠিন। বিশেষ অভিজ্ঞ আলিমগণের পক্ষেই এইরূপ যুক্তি ও প্রমাণের পথ প্রশস্ত দর্শন-পুস্তকের চতুর্থ অধ্যায়ে এ বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে।

তৃতীয় উপায়—অনুসরণ। সর্বসাধারণ লোকের পক্ষে ইহাই প্রশস্ত পথ। নবী, ওলী ও অভিজ্ঞ আলিমগণের দর্শন লাভ করিলে পরকালের জ্ঞানালোক অন্তরে প্রবেশ করে। তাঁহাদের সংসর্গে থাকিয়া যে সৌভাগ্য লাভ হয়, ইহাকে প্রকৃত ঈমান বলে। কামিল পীর ও পরহেযগার আলিমের সংসর্গে থাকিয়াও যে ব্যক্তির ধর্মজ্ঞান জন্মে না, সে পরম হতভাগা। আবার আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে যে পীর ও আলিম যত উন্নত হন, তাঁহাদের সংসর্গে লোকের ঈমানও তত দৃঢ় ও সতেজ হইয়া উঠে। এইজন্যই সাহাবাগণ (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা) দর্শন ও সংসর্গের কল্যাণে নিতান্ত অটল ঈমান এবং পরম সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। পরবর্তীকালের যাঁহাদের ভাগ্যে হযরতের (সা) দর্শন ঘটে নাই, তাঁহার সাহাবাগণের (রা) দর্শন ও সংসর্গ লাভ করিয়া উৎকৃষ্ট মানব শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইলেন। এই কারণেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন– "আমার সময়ের লোক (অর্থাৎ সাহাবাগণ) সর্বোৎকৃষ্ট; তৎপর যাহারা তাহাদের (অর্থাৎ সাহাবাদের) দর্শন লাভ করিয়াছে (অর্থাৎ তাবিয়ীগণ)।" সাহাবা ও তাবিয়ীগণের উদাহরণ এই যে, মনে কর, এক বালক দেখে যে, তাহার মাতাপিতা সর্প দেখিয়া পলায়ন করে; এমনকি তাহারা সর্প দেখিয়া স্বীয় ঘরবাড়ী পর্যন্ত পরিত্যাগ করে। এমতাবস্থায়, মাতা-পিতার সর্প-ভীতি সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া দেখিলে অবশ্যই তাহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিবে যে, সর্প নিশ্চয়ই অনিষ্টকর প্রাণী এবং ইহা হইতে পলায়ন করাই উত্তম। তৎপর এই বালক কোন স্থানে সর্প দেখামাত্রই তথা হইতে ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিবে। এমনও হইতে পারে যে, বালক কখনও সর্প দেখে নাই, ইহার নাম শুনিয়াছে মাত্র; তথাপি মাতাপিতার সর্পভীতি দেখিয়া তাহাদের হৃদয়ে সর্প ভয়ে একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িবে। নবীগণের অন্তদৃষ্টি প্রত্যক্ষ দর্শনতুল্য। যেমন মনে কর, এক

ব্যক্তি দেখিতে পাইল অমুককে সাপে কাটিয়াছিল, সে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে এবং অমুককে কাটিয়াছিল, সেও মরিয়াছে। এইরূপ প্রত্যক্ষ দর্শনে সর্প বিষের অনিষ্টকারিতা অবগত হওয়া যায় এবং প্রত্যক্ষ দর্শনেই বিশ্বাসের পূর্ণতা লাভ হয়।

গভীর জ্ঞানসম্পন্ন সুনিপূণ আলিমগণের উদাহরণ এইরূপ যে, মনে কর, এক ব্যক্তি সর্প-বিষে মানুষ মরিতে দেখে নাই। কিন্তু সে বিষ ও মানুষে প্রকৃতি এবং মানুষের উপর বিষক্রিয়ার অনিষ্টকারিতা জ্ঞান বলে বুঝিয়া লইয়াছে। এমন পরিপক্ক জ্ঞান দ্বারাও দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিতে পারে। কিন্তু প্রত্যক্ষ দর্শনে বিশ্বাস যত দৃঢ় হয়, জ্ঞানলব্ধ বিশ্বাস তত দৃঢ় হয় না। অভিজ্ঞ আলিমগণ ব্যতীত সাধারণ লোকের বিশ্বাস পরিপক্ক আলিম ও বুযুর্গগণের সংসর্গ প্রভাব জন্মিয়া থাকে এইরূপ লোকের সংসর্গলাভ করত পথভ্রান্তিরূপ রোগের প্রতিকার করা সাধারণ লোকের পক্ষেও নিতান্ত সহজসাধ্য।

দ্বিতীয় উপমা—কতক লোক এমন আছে যে, তাহারা পরকালে একেবারে অবিশ্বাসী নহে এবং পরকালের অস্তিত্বই নাই বলিয়া তাহারা মনে করে না। কিন্তু এই বিষয়ে তাহারা সর্বদা অস্বস্তি অনুভব করে, কিছুতেই নিঃসন্দেহ হইতে পারে না এবং বলে– "পরকালের যথার্থতা বুঝিবার উপায় নাই।" শয়তান এই সুযোগে প্ররোচনা দিয়া বলিতে থাকে– "দুনিয়া নিশ্চিত এবং পরকাল সন্দেহপূর্ণ। নিশ্চিত পদার্থকে অনিশ্চিত বিষয়ের জন্য পরিত্যাগ করা উচিত নহে।" এইরূপ ধারণা নিতান্ত অমূলক। কারণ, ঈমানদারদের নিকট পরকাল নিশ্চিত সত্য। পরকালে এমন সন্দিহান লোকদের সন্দেহ দূরীকরণের উপায় এই ঃ রোগ হইলে ঔষধ সেবনের তিক্ততাবোধটি অবধারিত ধ্রুব সত্য। কিন্তু রোগ-মুক্তি সন্দেহপূর্ণ। তদ্রূপ বাণিজ্য ব্যপদেশে সমুদ্র যাত্রার কষ্ট অবধারিত এবং বাণিজ্যের লাভ সন্দেহজনক। রোগ- মুক্তির আশায় ঔষধ সেবনের তিক্ততা সহ্য করিয়া থাক। আর লাভের আকাঙ্ক্ষায় সমুদ্রযাত্রীরা কষ্ট স্বীকার কর। এমতাবস্থায়, ক্ষণভঙ্গুর দুনিয়া পরিত্যাগ করত পরকালের নিশ্চিত ও চিরস্থায়ী সৌভাগ্য অর্জনে তৎপর হইবে না কেন? আবার মনে কর, তুমি প্রবল পিপাসার্ত হইয়া পানি পান করিতে উদ্যত হইয়াছ, এমন সময় এক ব্যক্তি বলিল– "এই পানিতে সাপে মুখ দিয়াছিল।" পানি পানে বিরত থাকিলে পিপাসার কষ্ট সহ্য করিতে হইবে বটে, কিন্তু ইহাতে সত্যই বিষ মিশ্রিত থাকিলে ইহা পানে মৃত্যু অবধারিত। পিপাসার কষ্ট সহ্য করা যায়; কিন্তু প্রাণনাশের যন্ত্রণা সহ্য করা যাইতে পারে না।"

তোমার কথার উত্তরে আমরা বলিতে চাই যে, দুনিয়ার সুখ দীর্ঘ হইলেও একশত বৎসরের অধিককাল স্থায়ী থাকিবে না। পরমায়ু শেষ হইলে জীবনকালটা একটি অলীক স্বপ্ন বা কল্পনা বলিয়া মনে হইবে। অপরপক্ষে, পরকাল চিরস্থায়ী। চিরকালের

দুঃখ যন্ত্রণা সহ্য করা যাইতে পারে না। কিন্তু পরকাল যদি মিথ্যা হয়, তবে মনে কর, দুনিয়াতে তুমি যে সময়টুকু থাকিবে, ইহাও মিথ্যা, যেমন জন্মের পূর্বে তুমি কিছুই ছিলে না এবং মৃত্যুর পরও কিছুই থাকিবে না। অপরপক্ষে, পরকাল যদি বাস্তবিকই সত্য হয়, আর তুমি ইহাকে অবিশ্বাস কর, তবে অনন্তকালের কষ্ট কিরূপে সহ্য করিবে? এমতাবস্থায়, পরকাল বিশ্বাস করত তদনুযায়ী কাজ করিলেই অনন্তকালের ভীষণ যন্ত্রণা হইতে মুক্তি পাইতে পার। এই কারণেই হযরত আলী (রা) এক অবিশ্বাসীকে বলিয়াছিলেন– "তুমি যাহা মনে করিতেছ, তাহাই সত্য হইলে সকলেই মুক্তি পাইল। আর তোমার ধারণা মিথ্যা হইলে আমরা (পরকালে বিশ্বাসীগণ) মুক্তি পাইব এবং তোমরা (পরকালে অবিশ্বাসীগণ) শাস্তিতে নিপতিত হইবে।"

তৃতীয় উপমা—কতক লোক এমন আছে যাহারা পরকাল বিশ্বাসী বটে, কিন্তু তাহারা বলে– "দুনিয়া নগদ, আর পরকাল বাকী; নগদ বাকী অপেক্ষা বহু গুণে উৎকৃষ্ট।" তাহারা বুঝে না যে নগদ আর বাকী সমান সমান হইলে নগদ অবশ্যই উৎকৃষ্ট। কিন্তু যে স্থানে নগদ এক গুণমাত্র এবং বাকী ইহার সহস্রগুণ, সেই স্থানে নগদ হইতে বাকীই উত্তম। সংসারের ব্যবসা, বাণিজ্য এই সত্যের উপর নির্ভর করিয়াই চলিতেছে। যে ব্যক্তি এতটুকু বুঝিতে পারে না, সে নিতান্ত পথভ্রান্তিতে নিপতিত রহিয়াছে।

চতুর্থ উপমা—কতক লোক পরকালে বিশ্বাসী বটে, কিন্তু তাহারা দুনিয়াতে নানাবিধ উপাদেয় বস্তু ভোগ করিতে পাইতেছে ও সচ্ছলতার সহিত জীবন যাপন করিতেছে দেখিয়া মনে করে– "দুনিয়াতে আল্লাহ্ আমাদিগকে যেরূপ সুখ-সাচ্ছন্দের সহিত রাখিয়াছেন, পরকালেও তিনি আমাদিগকে তদ্রূপ অবস্থায় রাখিবে; কারণ, আল্লাহ্ আমাদিগকে ভালবাসেন বলিয়াই আমাদিগকে উপাদেয় দ্রব্যসামগ্রী ও সচ্ছলতা দান করিয়াছেন, পরকালেও তিনি আমাদের সহিত এইরূপ ব্যবহারই করিবেন।" সূরা কাহাফে বর্ণিত এক ভ্রাতা-ভগ্নীর কাহিনীর সহিত তাহাদের এইরূপ উক্তির সাদৃশ্য রহিয়াছে। তাহাদের মধ্যে ধনী ব্যক্তি দরিদ্রকে বলিল–

وَلَئِنْ رُّدِدْتُّ اِلٰى رَبِّىْ لَاَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا

"আর যদি আমি আমার প্রভুর দিকে ফিরিয়াই যাই (তবে) ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ফিরিয়া যাইবার স্থান পাইব।" (সূরা কাহাফ, ৫ রুকূ ১৫ পারা)।

অপর ব্যক্তি বলিল– اِنَّ لِىْ عِنْدَهٗ لَلْحُسْنٰى

"নিশ্চয়ই আমার জন্য যাহা উত্তম তাহা তাঁহার (আল্লাহ্র) নিকটে আছে।" (সূরা হা-মীম সিজদা, ৬ রুকু ২৫ পারা)। এইরূপ পথভ্রান্তির প্রতিকার এই ঃ ভাবিয়া

দেখ, সন্তান প্রাণ-প্রিয় হইলেও ভবিষ্যতের মঙ্গলের জন্য সর্বদা তাহাকে শিক্ষকের শাসনাধীনে রাখা হয়। অপরপক্ষে, গোলাম অপ্রিয় হইলেও তাহাকে স্বেচ্ছায় চলিতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। আর সে স্বেচ্ছায় আমোদ-প্রমোদে জীবন অতিবাহিত করে। কারণ এই যে, প্রভু গোলামের ভবিষ্যত দুর্ভাগ্যের জন্য উদ্বিগ্ন থাকে না। ইহাতে যদি গোলাম মনে করে যে, প্রভু তাহাকে স্বীয় সন্তান অপেক্ষা অধিক ভালবাসে, তবে ইহা গোলামের নিতান্ত মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নহে। মহাপ্রভু আল্লাহ্ও এই সাধারণ নিয়ম প্রচলিত রাখিয়াছেন যে, তাঁহার প্রিয়-পাত্রদিগকে তিনি দুনিয়ার ঐশ্বর্য ও আমোদ-প্রমোদ ছাড়িয়া দেন নাই। অথচ তাঁহার শত্রুদিগকে তিনি অতুল ঐশ্বর্য ও আমোদ-প্রমোদে জীবন অতিবাহিত করিতে ছাড়িয়া দিয়াছেন। যে কৃষক আমোদ-প্রমোদে বিভোর থাকিয়া আলস্য-শয্যায় শয়ন করত বীজ বপন করে না, সে যথাসময়ে শস্যও কর্তন করিতে পাইবে না। পরকালে অবিশ্বাসী ব্যক্তিকে এইরূপ কৃষকের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে।

পঞ্চম উপমা- কতক লোক বলিয়া থাকে, আল্লাহ্ নিতান্ত দয়ালু ও দানশীল। তিনি সকলকেই বেহেশ্ত দান করিবেন। মূর্খেরা বুঝিতে পারে না যে, তিনি তাঁহার করুণা লাভের সকল উপকরণ দান করিয়াছেন; ইহা অপেক্ষা অধিক দয়ার আর কি হইতে পারে? ভাবিয়া দেখ, তুমি ভূমিতে একটি বীজ বপন কর এবং ইহার বিনিময়ে সাত শত শস্যদানা লাভ করিয়া থাক; আর সামান্য ইবাদতের পরিবর্তে চিরস্থায়ী রাজত্বের (বেহেশ্তের) অধিকারী হও। আল্লাহ্র করুণা ও দয়ার যদি এই অর্থ হয় যে, বীজ বপন না করিয়াই শস্য পাইবে, তবে কৃষি-বাণিজ্যে ও জীবিকা-অর্জনে এত ছুটাছুটি কর কেন? এই সকল ক্ষেত্রে সন্তুষ্ট চিত্তে বসিয়া থাক, কোন কাজই করিও না। কারণ, আল্লাহ্ পরম দানশীল ও সর্বশক্তিমান। তিনি বিনা চাষে বিনা বীজ বপনেও শস্য জন্মাইয়া থাকেন। তদুপরি জীবিকা সম্বন্ধে আল্লাহ্ স্বয়ং বলিতেছেন-

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا

অর্থাৎ "পৃথিবীতে এমন কোন প্রাণী নাই যাহার জীবিকার ভার স্বয়ং আল্লাহ্র উপর ন্যস্ত নহে।" (সূরা হুদ, ১ রুকু, ১২ পারা)। এতদ্সত্ত্বেও তোমরা সাংসারিক কার্যে আল্লাহ্র করুণা ও বদাণ্যতা উপর নির্ভর করত চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পার না। আর পারলৌকিক ব্যাপারে ঐরূপ বিশ্বাস করিয়া গা ছাড়িয়া দাও, অথচ পারলৌকিক বিষয়ে আল্লাহ্ স্বয়ং বলেন-

وَاَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى

"আর এই যে, মানুষ যতটুকু চেষ্টা করিয়াছ ততটুকু ভিন্ন তাহার জন্য আর কিছুই নাই।" (সূরা নজম, ৩ রুকু, ২৭ পারা)। ইহা সত্ত্বেও সাংসারিক কার্যের জন্য আল্লাহ্‌র করুণার উপর নির্ভর না করিয়া কেবল পারলৌকিক কার্যের বেলায় সকল চেষ্টা যত্ন পরিত্যাগ করত তাঁহাকে করুণাময় বলিয়া নিশ্চিত থাকা নিতান্ত পথ-ভ্রান্তি। যেমন রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "যে ব্যক্তি প্রবৃত্তির অনুসরণ করিয়া চলে, অথচ আল্লাহ্‌র নিকট হইতে সুফল পাইবার আশা করে, সে নিতান্ত নির্বোধ।" আল্লাহ্ অসীম ক্ষমতাশীল। তিনি বিনা সহবাসে বিনা বীর্যে সন্তান জন্মাইতে পারেন। তথাপি যে ব্যক্তি স্ত্রী সহবাস ব্যতীত সন্তান কামনা করে, সে নিতান্ত নির্বোধ। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি স্ত্রী সহবাস করিয়া বীর্ষ স্থাপনপূর্বক আশা করে যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ গর্ভস্থ বীর্যকে সকল বিপদ-আপদ হইতে রক্ষা করত সন্তান উৎপন্ন করিয়া দিবেন, সেই ব্যক্তিই বুদ্ধিমান। এইরূপে যে ব্যক্তি ঈমান আনে নাই বা ঈমান আনিয়াও সৎকার্য করে নাই, অথচ পরকালে পরিত্রাণের আশা করে, সেই ব্যক্তি নিতান্ত নির্বোধ।

যে ব্যক্তি ঈমান আনয়নপূর্বক সৎকর্ম করিয়া আল্লাহ্‌র করুণার উপর এইরূপ আশা করে যে, তিনি মৃত্যুর আপদ হইতে রক্ষা করত নিখুঁত ঈমান সহকারে পরলোকে পার করিয়া লইবেন, সেই ব্যক্তি বুদ্ধিমান। আর যে ব্যক্তি বলে- আল্লাহ্ আমাকে ইহলোকে উত্তম অবস্থায় রাখিয়াছেন এবং পরলোকেও তদ্রূপ রাখিবেন। কারণ, তিনি নিতান্ত দয়ালু ও দানশীল। এমন ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর অহেতুক অভিমান ও অহংকার করিয়া থাকে মাত্র। আর যে ব্যক্তি দুনিয়াকে নগদ ও অবধারিত এবং পরকালকে বাকী ও সন্দেহপূর্ণ বলিয়া মনে করে, সে দুনিয়ার প্রলোভনে ভুলিয়া অচেতন হইয়া রহিয়াছে। এই উভয় অবস্থা পরিত্যাগ করিবার জন্য আল্লাহ্ আদেশ দিয়াছেন। তিনি বলেন- "হে মানবজাতি, আমার অঙ্গীকার ধ্রুব সত্য। কারণ, যাহার কর্ম ভাল হইবে, সে উত্তম পুরস্কার পাইবে। আর যে মন্দ কার্য করিবে, সে কঠিন শাস্তি ভোগ করিবে।" আল্লাহ্‌র এই অঙ্গীকার গভীর মনোনিবেশ সহকারে শ্রবণ কর। দুনিয়াতে মত্ত হইয়া থাকিও না এবং মনে করিও না যে, আল্লাহ্ করুণাময় বলিয়া তুমি যাহা করিবে তাহাই তিনি ক্ষমা করিবেন।

গুরুর (ভ্রম-বিশ্বাসে ধোঁকায় পড়া) ও ইহার প্রতিকার

ভ্রম-বিশ্বাসজনিত ধোঁকায় পতিত লোকের বিবরণ—প্রিয় পাঠক, জানিয়া রাখ, কতক লোক মন্দকে ভাল ও ভালকে মন্দ জানিয়া বিষম ধোঁকায় পতিত রহিয়াছে। তাহারা নিজকে ভাল বলিয়া মনে করে এবং নিজের কার্য-কলাপকে উত্তম বলিয়া

জানে। আর এইরূপ ধারণার আপদসমূহ হইতে তাহারা একেবারে উদাসীন। এই শ্রেণীর লোকেরা স্বর্ণ পরীক্ষাজ্ঞানে পূর্ণতা লাভ করে নাই। কেবল বাহিরের বর্ণ ও আকৃতি দেখিয়াই মেকী স্বর্ণকে বিশুদ্ধ মনে করিয়া ধোঁকায় পতিত রহিয়াছে। এইজন্যই তাহারা ভাল-মন্দে তারতম্য করিতে পারে না। যাহারা জ্ঞানান্বেষণ ও সৎকর্ম অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত আছে এবং পথভ্রান্তি ও ধর্ম-কর্মে শিথিলতার আবরণ হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছে, তাহাদের শতকরা নিরান্নব্বই জনই তদ্রূপ ধোঁকায় পড়িয়া রহিয়াছে। এইজন্যই রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন যে, মহাপ্রভু আল্লাহ্ কিয়ামত দিবস হযরত আদমকে (আ) তাঁহার সন্তানদের মধ্যে দোযখবাসীদিগকে পৃথক করিয়া দিতে আদেশ করিবেন। তিনি বলিলেন- "হে আল্লাহ্, কত জনের মধ্যে কত জনকে পৃথক করিব?" আল্লাহ্ বলিবেন- "হাজার প্রতি নয়শত নিরান্নব্বই জন দোযখী পৃথক করিয়া ফেল। যদিও তাহারা সর্বদা দোযখে থাকিবে না, তথাপি অবশ্যই একবার দোযখে যাইবে।" ইহার কারণ এই যে, উহাদের কতক উদাসীন, কতক পথভ্রান্ত, কতক ভালকে মন্দ ও মন্দকে ভাল জ্ঞানে ধোঁকায় পতিত এর কতক অসহায় স্বীয় কুপ্রবৃত্তির কবলে নিষ্পেষিত থাকিবে। ত্রুটি স্বীকার করিলেও তাহারা একবার দোযখে প্রবেশ করিবে। ভ্রম-বিশ্বাসজনিত ধোঁকায় পতিত লোকের সংখ্যা অসংখ্য অগণিত। তথাপি তাহাদিগকে চারি শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে; যথা ঃ (১) আলিম, (২) আবিদ, (৩) সূফী ও (৪) ধনী।

আমলহীন আলিমের ভ্রম-বিশ্বাসজনিত ধোঁকা—এই শ্রেণীর কতক আলিম আজীবন চেষ্টায় অগাধ ইলমের অধিকারী হয় বটে, কিন্তু তদনুসারে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কার্য করে না। তাহারা স্বীয় হস্ত, চক্ষু, রসনা ও গুপ্তাঙ্গকে পাপ হইতে বিরত রাখে না। অথচ মনে করে যে, তাহারা এত জ্ঞানের অধিকারী হইয়াছে যে, ইহার কল্যাণে পরকালে তাহাদের মোটেই শাস্তি হইবে না, ব্যবহারিক জীবনে ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য তাহাদের ধর-পাকড় হইবে না এবং সকল লোক তাহাদের সুপারিশেই পরিত্রাণ পাইবে। এমন আলিম এইরূপ রোগী সদৃশ, যে স্বীয় রোগের চিকিৎসায় সুদক্ষ, সমস্ত রজনী রোগ নির্ণয়ে ও পঠিত গ্রন্থের আলোচনায় অতিবাহিত করত ব্যবস্থাপত্র লিপিবদ্ধ করিয়াছে, রোগ ও ইহার ঔষধ তিক্ততা সহ্য করিতে চায় না। এমতাবস্থায়, ঔষধের ফল ও ক্রিয়ার ব্যাখ্যা বারবার পাঠ করিলে তাহার কি উপকার হইবে? আল্লাহ্ বলেন- "নিশ্চয়ই ঐ ব্যক্তি মুক্তি পাইবে, যে পবিত্র হয়।" যে ব্যক্তি কেবল পবিত্রতা জ্ঞান অর্জন করিয়াছে, সে মুক্তি পাইবে, এই কথা আল্লাহ্ কখনই বলেন নাই। তিনি অন্যত্র বলেন- "যে ব্যক্তি স্বীয় প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ করিবে সেই বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে।" যে ব্যক্তি শুধু জানে যে, প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ করা উচিত, সে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে না।

আমলহীন আলিমের উক্তরূপ ভ্রমবিশ্বাস যদি নির্বুদ্ধিতা ও ইলমের ফযীলত বর্ণনা সম্বলিত হাদীস বাণী হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, তবে এমন ব্যক্তি বেআমল (অনুষ্ঠানশূন্য) আলিমের নিন্দা প্রকাশক আয়াত ও হাদীসের প্রতি গভীরভাবে মনোনিবেশ করিয়া দেখে না কেন? কুরআন শরীফে বেআমল আলিমকে এমন গর্দভের সহিত তুলনা করা হইয়াছে, যাহার পৃষ্ঠে ইলমের উপকরণ গ্রন্থসমূহের বোঝা রহিয়াছে। অন্যত্র তাহাকে প্রস্তরসদৃশ বলা হইয়াছে। রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "বেআমল আলিম দোযখে এমনভাবে নিক্ষিপ্ত হইবে যে, তাহার গ্রীবা ও পৃষ্ঠ ভাঙ্গিয়া যাইবে এবং গর্দভ যেরূপে আটার মেশিন ঘুরায় অগ্নি তাহাকে তদ্রূপ ঘুরাইবে। (তাহার দুর্গতি দেখিয়া) সমস্ত দোযখবাসী তাহার চতুর্দিকে সমবেত হইবে এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে- 'ওহে, তুমি কে এবং কি কারণে তোমাকে এইরূপ কঠিন শাস্তি দেওয়া হইতেছে?' সেই ব্যক্তি বলিবে- 'আমি অপরকে সৎকার্যের আদেশ করিতাম; কিন্তু নিজে তদনুযায়ী কাজ করিতাম না।" তিনি অন্যত্র বলেন-"বেআমল আলিম অপেক্ষা অধিক শাস্তি আর কাহাকেও দেওয়া হইবে না।" হযরত আবূ দরদা রাযিআল্লাহু আন্‌হু বলেন-"মূর্খ লোকের দুর্গতি অপেক্ষা বেআমল আলিমের দুর্গতি সাতগুণ শোচনীয় হইবে।" কারণ ইলমই তাহার বিরুদ্ধে প্রমাণ হইবে এবং তাহাকে বলা হইবে-"তুমি জানিয়া-শুনিয়া পাপ করিয়াছ।"

কুপ্রবৃত্তি দমনে অক্ষম আলিমের ভ্রম—কোন কোন আলিমের জ্ঞান ও অনুষ্ঠান উভয়টিতেই ত্রুটি থাকে না। তাহারা প্রকাশ্য ইবাদতসমূহ করিয়া থাকে বটে, কিন্তু অন্তরের পবিত্রতা বিধানে একেবারে উদাসীন। অহংকার, ঈর্ষা, রিয়া, সম্মান-লিপ্‌সা ও প্রভুত্ব-প্রিয়তা, পরের অনিষ্ট কামনা, অপরের শোকে আনন্দবোধ ও সুখে কষ্টানুভব ইত্যাদি কুপ্রবৃত্তি হইতে তাহারা স্বীয় হৃদয়কে মুক্ত রাখে না। কুপ্রবৃত্তির অনিষ্টকারিতা সম্বন্ধে রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যে সকল উক্তি করিয়াছেন, তৎসমূদয়ের প্রতি তাহারা মনোনিবেশ করিয়া দেখে না। তিনি বলেন-"বিন্দুমাত্র রিয়াও শিরক।" "যাহারা হৃদয়ে রেণু পরিমাণ অহংকার থাকিবে, সে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে না।" "অগ্নি যেমন শুষ্ক কাষ্ঠ জ্বালাইয়া দেয়, ঈর্ষাও তদ্রূপ ঈমান নষ্ট করিয়া ফেলে।" "আল্লাহ্ তোমাদের আকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না, তিনি তোমাদের হৃদয় দেখিয়া থাকেন।"

মন্দ স্বভাব মন্দ কার্যের মূল উৎস। ইহার মূলোৎপাটন করিয়া দূর করা আবশ্যক। যাহার বাহিরের আকার সুশোভিত, কিন্তু ভিতর অপবিত্র ও পুতিগন্ধময় তাহাকে এমন পায়খানার সহিত তুলনা করা যায় যাহার বাহিরের অংশ চুনকাম করাতে শুভ্র পবিত্র বলিয়া মনে হয়, কিন্তু ভিতর মল-মূত্র একেবারে অপবিত্র ও দুর্গন্ধময়। অথবা

তাহাকে কবরের সহিত তুলনা করা চলে। কবর বাহিরে সুন্দর দেখায়, কিন্তু ভিতরে মৃতদেহ পচিয়া বীভৎস আকার ধারণ করে। অথবা তদ্রূপ লোককে এমন অন্ধকারময় গৃহের তুল্য বলা যায় যাহার বাহিরের প্রাচীর পৃষ্ঠ প্রদীপের আলোকে উজ্জ্বল থাকে, অথচ গৃহাভ্যন্তরভাগ ঘোর অন্ধকারে পরিপূর্ণ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বেআমল আলিমকে চালনির সহিত তুলনা করিয়াছেন। চালনির ছিদ্র দিয়া তো উৎকৃষ্ট আটা পাওয়া যায়; কিন্তু ভুসিগুলি ইহাতে আটকানো থাকে। বেআমল আলিমও তদ্রূপ জ্ঞানগর্ভ বাক্য বাহির করিয়া ফেলে, কিন্তু মন্দ বাক্যসমূহ তাহার অন্তরে থাকিয়া যায়।

আত্মপবিত্র বিশ্বাসী আলিম ব্যক্তির ভ্রম—কোন কোন আলিম কুপ্রবৃত্তিকে নিতান্ত অনিষ্টকর বলিয়া জানে এবং উহা হইতে হৃদয় পবিত্র রাখাও আবশ্যক বলিয়া মনে করে। অথচ স্বীয় হৃদয়কে কুপ্রবৃত্তিশূন্য পবিত্র বলিয়া ধারণা করে। এই প্রকার আলিম যাহারা কুপ্রবৃত্তি অনুসরণ করিয়া চলে তাহাদের অপেক্ষাও মন্দ। কারণ, আলিমগণই কুপ্রবৃত্তির অনিষ্টকারিতা সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা অধিক অবগত আছে, তথাপি তাহাদের অন্তরে অহংকারের প্রভাব দেখা দিলে শয়তান তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেয় যে, উহা অহংকার নহে, বরং ইহাতেই ইসলাম ধর্মের সম্মান ও গৌরব নিহিত আছে। তোমরাই ধর্মের বাহক, তোমরা যদি নিজেদের সম্মান রক্ষা করিয়া না চল তবে ইসলাম কিরূপে সম্মান লাভ করিবে ? তদ্রূপ আলিম যদি উত্তম পরিচ্ছদে স্বীয় দেহ সুশোভিত করে, অশ্ব এবং বহুমূল্য ও সুন্দর সুন্দর গৃহ-সামগ্রী ব্যবহার করে তবে শয়তান বুঝাইয়া দেয় যে, উহা গর্ব ও সংযমহীনতা নহে, বরং ইসলামের শত্রুদিগের পরাভব ও হীনতা প্রতিপন্ন করাই উহার উদ্দেশ্য। কারণ, ধর্ম-কর্মে কুসংস্কার প্রবর্তকগণ আলিমদিগকে সুপ্রতিষ্ঠিত ও জাঁক-জমকপূর্ণ দেখিলেই সংযত ও বশীভূত হইয়া থাকে। এই শ্রেণীর আলিমগণ কি রাসূলুল্লাহ্ (সা), খুলাফায়ে রাশিদীনের (রা) জীবনচরিত্র ভুলিয়া গিয়াছে এবং মনে করে যে, তাঁহাদের কার্যাবলী ও জীবন ধারণ-প্রণালী ইসলামে অসম্মান ও দীনতাহীনতা আনিয়া দিয়াছিল? আর তাহাদের নিজেদের শান-শওকতে ইসলাম এখন সমুন্নত ও সম্মানিত হইবে?

তদ্রূপ, আলিমের হৃদয়ে ঈর্ষার উদ্রেক হইলে বলিয়া থাকে- ইহা ঈর্ষা নহে, বরং ধর্মের মর্যাদা রক্ষার্থে পাপীদের প্রতি কঠোরতা মাত্র। রিয়া আসিলে তেমন ব্যক্তি বলে- ইহা রিয়া নহে, মানব সমাজের উপকার করিবার ইচ্ছামাত্র। কারণ, আমাদের ইবাদত কার্য দেখিয়া অপর লোকে অনুকরণ করতে সৌভাগ্য লাভে সমর্থ হইবে। ঐরূপ আলিম রাজ দরবারে যাতায়াত করিলে বলে- আমরা অত্যাচারী শাসনকর্তাদের দরবারে তাহাদের সম্মুখে মস্তক অবনত করিতে যাই না। ইহা যে হারাম, আমরা তাহা অবগত আছি। তবে আমরা মুসলমানদের সহিত হিত-সাধনের জন্য অনুরোধ

করিতে রাজ দরবারে যাইয়া থাকি। হারাম ধন গ্রহণের সময় তদ্রূপ আলিম বলিয়া থাকে- এই ধনের কোন উত্তরাধিকারী নাই। আমরা ইহা গ্রহণপূর্বক ধর্ম-কর্মে ব্যয় করিব।

এই শ্রেণীর আলিমগণ ন্যায়-বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিবে যে, মানুষকে সংসারাসক্তি হইতে ফিরাইতে পারিলে সমাজের যত মঙ্গল সাধিত হয় ততটুকু অন্য কোন উপায়েই হইতে পারে না এবং তাহাদের কারণেই সংসারাসক্ত লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। এবংবিধ আলিমের অস্তিত্ব না থাকিলেই ইসলামের শ্রীবৃদ্ধি হইবে এবং তদ্রূপ কুপ্রবৃত্তিপূর্ণ হৃদয় বিশিষ্ট আলিমের আবশ্যকতা ইসলামে নাই।

যাহাই হউক, উল্লিখিতরূপ ভ্রান্ত ধারণা এবং ভালকে মন্দ ও মন্দকে ভাল জ্ঞানে ধোঁকায় পতিত হওয়ার অন্ত নাই। উহার বিস্তারিত বর্ণনা ইতিপূর্বে করা হইয়াছে। পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

মঙ্গলজনক ইলম নির্বাচনে ভ্রম—কতক আলিম মঙ্গলজনক ইলম নির্বাচনেই ভ্রমে পড়িয়া রহিয়াছে। তাফসীর, হাদীস, ফিকাহ, আধ্যাত্মিক বিদ্যা, সৎস্বভাব ও চরিত্র উন্নতিকর বিদ্যা, কুপ্রবৃত্তি দমনে সাধনাবিদ্যা, এই গ্রন্থের যে সকল জ্ঞানের কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে উহা পরকালের পথের পরিচয়, ধর্মপথের আপদসমূহের জ্ঞান এবং মুরাকাবার উপায় ইত্যাদি শিক্ষা করা সকলের প্রতি অপরিহার্য কর্তব্য (ফরযে আইন) ও নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু তাহারা এবংবিধ জ্ঞানার্জনে যত্নবান হয় না। তাহারা ইহাও অবগত নহে যে, এই প্রকার জ্ঞানকেই প্রকৃত ইলম বলা হইয়া থাকে। এই শ্রেণীর আলিমগণ তর্ক শাস্ত্র, মযহাবী পক্ষপাতিত্ব, ফত্ওয়া বা মানব জাতির মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টিকারী বিদ্যা অর্জনে জীবন বিনষ্ট করে। অথবা তাহারা এমন বিদ্যা অর্জনে জীবন বিনষ্ট করে যাহা অল্পে তুষ্টি, ধর্ম-কার্যে আন্তরিকতা ও পরহেযগারীর দিকে আহ্বান করে না বা রিয়া ও ধর্ম-কর্মে শিথিলতা বৃদ্ধি করে। আধ্যাত্মিক বিদ্যা অর্জনে ব্যাপৃত ব্যক্তি কোন মঙ্গলজনক ইলম শিক্ষা করিতেছে বলিয়া তাহারা কল্পনাও করে না এবং মনে করে যে, এইরূপ ব্যক্তি প্রকৃত ইলম অর্জনে বিরত রহিয়াছে। এইরূপ ভ্রমবিশ্বাসের বিস্তৃত বর্ণনা এই গ্রন্থে সম্ভবপর নহে। 'এহ্ইয়াউল উলুম' গ্রন্থের 'গুরুর' অধ্যায়ে ইহার বিশদ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

উপদেশক আলিমের ভ্রম—কতক আলিম বক্তৃতা করিয়া বেড়ায়। তাহাদের বক্তৃতা ছন্দোময় এবং সূক্ষ্ম তত্ত্ব অথচ অসাড় কথায় পরিপূর্ণ থাকে। বক্তৃতাকালে তাহারা এমন সুন্দর সুন্দর শব্দ খুঁজিয়া লয় শ্রোতৃমণ্ডলী যাহা শুনিয়া বাহ্বা প্রদান করে ও বক্তার প্রশংসায় লিপ্ত হয়। শ্রোতার হৃদয়ে পরকাল ভয়ের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া দেওয়া যাহাতে পরকালের শাস্তি তাহাদের চক্ষের উপর প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে এবং

তাহারা পরকালের ভয়ে রোদন করিতে থাকে, ইহাই যে উপদেশ প্রদানের উদ্দেশ্য ইহা তাহারা উপলব্ধি করে না। তাহারা ইহাও ভুলিয়া যায় যে, প্রকৃত উপদেশ পরকাল ভয়ে জর্জরিত প্রাণের অভিব্যক্তি ছাড়া আর কিছুই নহে। যে উপদেশকের মনে পরকাল ভয়ের লেশমাত্রও নাই, কেবল ইহার ভান করে মাত্র, এমন ব্যক্তির উপদেশ কাহারও মনে কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। পরকালে ভয়শূণ্য উপদেশক আলিম সংসারে কম নহে। ইহার বিবরণও অতি বিস্তৃত।

ফিকাহ্ শাস্ত্রাভিজ্ঞ আলিমের ভ্রম—কতক আলিম ফিকাহ্ শাস্ত্র অধ্যয়নে জীবন অতিবাহিত করে। তাহারা ইহা বুঝে না যে, ফিকাহ্ শাস্ত্র পার্থিব শাসনকার্য পরিচালনার জন্য বিধি-নিষেধ ব্যতীত আর কিছুই নহে। পরকাল পথের জ্ঞানই অন্যবিধ। ফিকাহ্ শাস্ত্রাভিজ্ঞ আলিম অবগত আছে যে, যাহা প্রকাশ্য ফিকাহ্ অনুযায়ী বৈধ তাহাই পরকালেও মঙ্গলজনক হইবে। উদাহরণস্বরূপ মনে কর, এক ব্যক্তি বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্বেই স্বীয় যাকাতের মাল তদীয় পত্নীর নিকট বিক্রয় করত তাহারা মাল সে ক্রয় করিয়া লইল। এমতাবস্থায়, সেই ব্যক্তি প্রকাশ্য ফতওয়া অনুসারে যাকাতদানের দায় হইতে মুক্তি পাইবে। রাজকর্মচারী তাহার নিকট হইতে যাকাত চাহিতে পারিব না; কেননা তাহার দৃষ্টি কেবল বাহ্য ধনের উপর নিবদ্ধ এবং পূর্ণ এক বৎসরের পূর্বেই উক্ত ধন হস্তান্তরিত হইয়া গিয়াছে। ফিকাহ্ শাস্ত্রাভিজ্ঞ আলিমও হয়ত উক্ত ব্যক্তিকে যাকাত দানের দায় হইতে মুক্ত বলিয়া ফতওয়া দিবে এবং এই ধারণাও করিবে না যে, যে ব্যক্তি যাকাতের দায় হইতে অব্যাহতি পাওয়ার এইরূপ চালাকি করিবে, সে মহাপ্রভু আল্লাহ্ শাস্তি ও রোষে নিপতিত হইবে। যে ব্যক্তি আদৌ যাকাত দেয় না তৎপ্রতি আল্লাহ্ যেমন ক্রুদ্ধ হন, যাকাতের দায় হইতে মুক্তি পাওয়ার জন্য যে ব্যক্তি তদ্রূপ চালাকি করিয়া থাকে তৎপ্রতিও তিনি তদ্রূপই ক্রুদ্ধ হইয়া থাকেন। কারণ, কৃপণতা মানব হৃদয়ের একটি মারাত্মক দোষ এবং যাকাত দিলে কৃপণতার অপবিত্রতা হইতে মানবাত্মা পবিত্র হয়। কৃপণতাররূপ কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করিলে ইহা নিতান্ত মারাত্মক হইয়া উঠে। তদ্রূপ চালাকি দ্বারা কৃপণতারূপ কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করা হয়। সুতরাং চালাকি দ্বারা যখন কৃপণতা প্রবৃত্তির অনুসরণ করা হইল তখন বিনাশ সাধনের আর কিছুই বাকী রহিল না। আচ্ছা বলত, তেমন প্রতারণাকারী ব্যক্তি কিরূপে পরকালে শাস্তি হইতে অব্যাহতি পাইবে?

তদ্রূপ, আপন স্ত্রীকে জ্বালা-যন্ত্রণায় অস্থির করত মহরের দাবী ত্যাগ করাইয়া তাহার দ্বারা বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাইলে প্রকাশ্য ফতওয়া অনুযায়ী বৈধ হইবে বটে; কেননা কাযী বাহ্য উক্তির উপর নির্ভর করিয়াই ফতওয়া দিয়া থাকেন; অন্তরের ভেদের কথা সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ। কিন্তু সেইরূপ তালাক গ্রহণকারী ব্যক্তি

পরকালে আল্লাহ্‌র বিচারে ধৃত হইবে; কেননা, তদ্রূপ খোলা তালাক বলপ্রয়োগে সম্পন্ন হইয়াছে। এইরূপে লোক সমক্ষে কাহারও নিকট কিছু চাহিলে লজ্জায় পড়িয়া সে দেয় তবে প্রকাশ্য ফত্‌ওয়া অনুসারে তো ইহাতে কোন দোষ নাই; কিন্তু বাস্তবপক্ষে বলপ্রয়োগে ইহা ছিনাইয়া লওয়ারই শামিল। কারণ, প্রকাশ্যভাবে লাঠি মারিয়া কাড়িয়া লওয়া, আর লজ্জার চাবুক মারিয়া লওয়া একই কথা। এইরূপ বহু উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। যাহারা প্রকাশ্য ফিকাহ্ শাস্ত্র ব্যতীত আর কিছুই জানে না তাহারা এবংবিধ ভ্রমে নিপতিত রহিয়াছে।

শুচিবাই আবিদের ভ্রম—ভ্রম-বিশ্বাসী আবিদগণ ফযীলত লাভের আশায় ফরয কার্য ছাড়িয়া দিতে দেখা যায়। যেমন, পবিত্রতা সম্বন্ধে সন্দিহান ব্যক্তি অসময়ে নামায পড়ে। অপরদিকে, মাতা-পিতা ও বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি সে কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করে; অথচ পানির অপবিত্রতা সম্বন্ধে ক্ষীণতম কল্পনাও তাহার নিকট দৃঢ়তর হইয়া উঠে। আবার আহারে বসিলে সে সকল বস্তুকেই হালাল বলিয়া মনে করে; এমন কি স্পষ্ট হারাম হইতেও বিরত থাকে না। অপবিত্র বস্তু পায়ে লাগিবার ভয়ে পাদুকা পরিধান ব্যতীত সে পথ চলে না, অথচ একেবারে হারাম দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া থাকে। এই শ্রেণীর আবিদগণ সাহাবাগণের (রা) জীবনচরিত ভুলিয়া গিয়াছে। হযরত উমর রাযিআল্লাহু আন্‌হু বলেন— "আমি হারামে পতিত হওয়ার ভয়ে সত্তর হালাল পরিত্যাগ করিয়াছি।" এইরূপ সতর্কতা অবলম্বন সত্ত্বেও তিনি এক য়াহুদী স্ত্রীলোকর পাত্র হইতে পানি লইয়া ওযু করিয়াছিলেন। এই সকল ভ্রান্ত আবিদ আহারকালে হালাল-হারামে কোন প্রভেদ না করিয়া কেবল অঙ্গ-শুদ্ধির বেলায় বাড়াবাড়ি করিয়া থাকে। কাহাকেও ধোপার ধোওয়া কাপড় পরিধান করিতে দেখিলে তাহারা মনে করে যে, সে বড় পাপ করিল। অথচ কাফিরগণ রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে উপঢৌকনস্বরূপ যে বস্ত্র প্রদান করিত, তিনি ইহা পরিধান করিতেন। যুদ্ধ বিজয়ের পর কাফির দল হইতে যে দ্রব্যসম্ভার পাওয়া যাইত তন্মধ্য হইতে বস্ত্রও তিনি বিনা-দ্বিধায় পরিধান করিতেন। তিনি উহা ধৌত করিয়া পরিধান করিতেন বলিয়া কোন উল্লেখ নাই। কাফিরদের নিকট হইতে প্রাপ্ত তলওয়ার পরিধান করিয়া তিনি নামায পড়িতেন। এই তলওয়ারে যে লোহা ইত্যাদি থাকিত বা ইহার উপর যে চর্ম লাগানো থাকিত উহাকে কেহই অপবিত্র বলিয়া মনে করিতে না। সুতরাং যে ব্যক্তি উদর, রসনা, হস্তপদ ইত্যাদি অঙ্গসমূহকে হারাম বিষয়ে সংযত রাখে না, কেবল ওযু, গোসলের পবিত্রতা লইয়া বাড়াবাড়ি করে, সে শয়তানের নিকট হাস্যাস্পদ। যে ব্যক্তি সকল বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করে, কিন্তু ধুইবার বাড়াবাড়ি দ্বারা অধিক পানি অপচয় করে বা একবার ওযু করিয়া ইহা সন্দুর মত হইল না ভাবিয়া বারবার ওযু

করিয়া সময় নষ্ট করত আওয়াল ওয়াক্তে নামায পড়ে না, এমন ব্যক্তিও ভ্রান্ত-বিশ্বাসীদের অন্তর্গত। ইবাদত পুস্তকে অঙ্গ-শুদ্ধি অধ্যায়ে এই সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে।

সন্দেহবাতিক আবিদের নামায সংক্রান্ত ভ্রম—কতক আবিদের নামাযের নিয়তে নানারূপ সন্দেহ প্রবল হইয়া উঠে। নিয়ত নির্ভুল হইল না ভাবিয়া তাহারা বারবার নিয়ত করিতে থাকে। এমন কি নিয়ত বাঁধিবারকালে তাহারা উচ্চ রব করে এবং হাত নাড়াইয়া থাকে। এইরূপ সন্দেহবাতিক লোকেরা বুঝে না যে, উণ পরিশোধ, যাকাত দান এবং নামাযের নিয়তের বিধান, একইরূপ। নিয়ত বিশুদ্ধ হইল না ভাবিয়া কেহই দুইবার ঋণ পরিশোধ করে না বা দুইবার যাকাত দেয় না। আবার কেহ কেহ নামায পড়িবার কালে কুরআন শরীফের অক্ষরগুলির প্রকৃত উচ্চারণ লইয়া বাড়াবাড়ি করে। অক্ষরগুলি ঠিকভাবে উচ্চারণ করিতেই তাহারা ব্যস্ত থাকে। কুরআন শরীফের যে অংশ নামাযে পড়া হয়, ইহার অর্থের প্রতি মনোনিবেশ করা উচিত। 'আলহামদুলিল্লাহ্' (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য) বলিবার কালে যেন সমস্ত দেহ-মন কৃতজ্ঞতাভাবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে; اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ (আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং তোমা হইতেই সাহায্য প্রার্থনা করি) উচ্চারণের সময় এক অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌কে সর্বব্যাপী সর্বময় এবং নিজকে নিতান্ত অসহায় ও দুর্বল বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। اِهْدِنَا (আমাদিগকে পথ দেখাও) বলারকালে নিজের দুর্বলতা, আত্মোৎসর্গ ও কাকুতিতে নিমগ্ন হইতে হয়। যে ব্যক্তি শুধু উচ্চারণের পারিপাট্য লইয়া ব্যাপৃত, তাহার হৃদয়ে এইরূপ ভাবসমূহ কিরূপে উদয় হইবে" তেমন নামাযীর দৃষ্টান্ত এইরূপ যে, মনে কর, এক ব্যক্তি নিজের অভাব অভিযোগ বাদশাহ্‌র নিকট জ্ঞাপন করিতে যাইয়া তাঁহাকে সম্বোধণ করিয়া বলিল يَا اَيُّهَا الْاَمِيْرُ (হে বাদশাহ্) এবং সে বারবার এই বাক্যটিই উচ্চারণ করিতে লাগিল; আর يها। শব্দ ঠিকভাবে উচ্চারণ হইতেছে কিনা তৎপ্রতি মনোনিবেশ করিল এবং امير। শব্দের মীম অক্ষর সুন্দরভাবে উচ্চারণে ব্যাপৃত রহিল। এমতাবস্থায়, বাদশাহ্ অবশ্যই তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন।

কুরআন শরীফ পাঠ সংক্রান্ত ভ্রম—আর এক শ্রেণীর আবিদ লোক প্রত্যহ একবার কুরআন শরীফ খতম করে এবং তজ্জন্য তাহারা অতি দ্রুতবেগে পাঠ করে। কিন্তু তাহাদের মন কুরআন শরীফের প্রতি একবারে উদাসীন থাকে। গণনায় খতম বৃদ্ধি করত লোকের নিকট প্রকাশ করিয়া প্রশংসা লাভের উদ্দেশ্যেই তাহারা এত দ্রুত পাঠ করিয়া থাকে। তাহারা জানে না যে, কুরআন শরীফের প্রতিটি আয়াত মহাপ্রভু আল্লাহ্‌র নিকট হইতে তাঁহার বান্দার নিকট এক একটি স্বতন্ত্র অনুশাসনপত্র। ইহাদের কতকগুলিতে আদেশ, কতকগুলিতে নিষেধ, অপর কতকগুলিতে দানের প্রতিশ্রুতি ও

শাস্তি প্রদানের ভীতি, আবার কতকগুলিতে উপমা ও উপদেশ রহিয়াছে এবং কতকগুলিতে ভয় ও ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছে। মোটের উপর এবংবিধ সকল কথাই কুরআন শরীফে আছে। পাঠকের পক্ষেও আবশ্যক ভয়সূচক আয়াত পাঠকালে নিজের সমস্ত দেহমন ভয় প্রকম্পিত করে, প্রতিশ্রুতিসূচক আয়াত পাঠ করিয়া তদ্রূপভাবে আনন্দিত হয়, উপমার আয়াত পাঠকালে নিজকে উপমাস্থল মনে করিয়া উপদেশ গ্রহণ করে, উপদেশমূলক আয়াত পাঠকালে যেন সর্বাঙ্গ প্রয়োগ শ্রবণ করে, ভয় প্রদর্শনের আয়াত অধ্যয়নের সময় যেন ভয়ে নিমজ্জিত হয়। এই অবস্থাসমূহ অন্তরের সহিত সংশ্লিষ্ট। অন্তরে এইরূপ অবস্থা না জন্মাইয়া শুধু জিহ্বার অগ্রভাগ দ্রুত সঞ্চালনে কি লাভ? এমন দ্রুত পাঠককে নিম্নোক্ত মূর্খের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। মনে করে, বাদশাহ্ এক প্রজার নিকট কোন নির্দেশপত্র পাঠাইলেন। সে নির্দেশপত্র পাইয়া মুখস্ত করিতে লাগিল। কিন্তু ইহাতে যে আদশ ও নিষেধ রহিয়াছে, উহার প্রতি সে মোটেই মনোযোগ করিল না এবং নির্দেশপত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একেবারেই উদাসীন রহিল।

হজ্জ সংক্রান্ত ভ্রম—কতক লোক হজ্জে গমন করে এবং কা'বা গৃহের খাদেমরূপে তথায় অবস্থান করিতে থাকে। তাহারা রোযা রাখে; কিন্তু হৃদয় ও রসনা সংযত রাখিয়া রোযার হক আদায় করে না এবং কা'বাগৃহের পবিত্রতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ইহার উপযুক্ত সম্মানও করে না। তাহারা বিশুদ্ধ পাথেয় সংগ্রহ করিয়া হজ্জ যাত্রার গৌরবও রক্ষা করে না। তাহাদের মন সর্বদা মানুষের সহিত আবদ্ধ থাকে। কা'বা শরীফের খাদেম বলিয়া তাহারা অপরের সম্মানভাজন হইতে আশা করে এবং লোকসমক্ষে বলে— "আমি এতবার আরাফার মাঠে দণ্ডায়মান হইয়াছি এবং এত বৎসর কা'বা শরীফে অবস্থান করিয়াছি।" এই প্রকার হাজীর জানা উচিত, কা'বা শরীফে অবস্থানকালে স্বীয় গৃহের জন্য উদ্‌গ্রীব থাকা, কা'বা শরীফের খাদেম বলিয়া মনে সম্মান-লালসা জাগিয়া উঠা এবং সর্বদা অপরের নিকট হইতে কিছু পাওয়ার প্রত্যাশা করা অপেক্ষা নিজ গৃহে অবস্থান করত কা'বা শরীফের প্রতি উদ্‌গ্রীব থাকা বহু গুণে ভাল। কেহ তাহাদের নিকট হইতে কিছু চাহিয়া লয় কিনা, এই শ্রেণীর লোকের অন্তরে এই ভয় সর্বদা জাগরূক থাকে। তাই তাহাদের প্রতিটি গ্রাস অন্নে তাহাদের কৃপণতা বৃদ্ধি পায়।

পরহেযগার আবিদের ভ্রম—কতক পরহেযগার আবিদের অবস্থা এই যে, তাহারা সাধারণ পোশাক পরিধান করে, অল্প আহার করে এবং ধনাসক্তি পরিহার করে। কিন্তু লোকর ভক্তি ও সম্মান পাওয়ার লোভ তাহারা সংবরণ করিতে পারে না। লোকজন বরকত লাভের আশায় আগমন করিলে তাহারা সন্তুষ্টি প্রকাশ করে এবং লোকসমক্ষে নিজদিগকে বেশ সাজাইয়া রাখে। তাহারা জানে না যে, ধনাসক্তি অপেক্ষা সম্মান-লিপ্সা অধিক অনিষ্টকর, সম্মান-লিপ্সা দমন করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। কারণ, সম্মান-লালসায় মুগ্ধ হইয়া মানুষ অম্লানবদনে সকল কষ্ট সহ্য করিয়া থাকে।

যে ব্যক্তি সম্মান-লিপ্সা ও প্রভুত্ব-প্রিয়তা পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছেন, তিনিই যথার্থ পরহেযগার। কখন কখন এইরূপও হইয়া থাকে যে, অপরিপক্ক পরহেযগারদিগকে কিছু দিতে গেলে তাহারা উহা গ্রহণ করে না। তাহারা মনে করে অপরের নিকট হইতে কিছু লইলে লোকে বলিবে, এই ব্যক্তি পরহেযগার নহে। গোপনে গ্রহণ করত উপযুক্ত দরিদ্রের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিতে বলিলে ইহা তাহাদের নিকট স্বীয় মৃত্যু-বার্তার ন্যায় বলিয়া মনে হয়। লোকে পরহেযগার বলিয়া সম্মান করিবে না ভাবিয়া এইরূপ পরহেযগারগণ হালাল ধনও গ্রহণ করে না। এই জন্যই তাহারা দরিদ্রের অপেক্ষা ধনীদিগকে অধিক সম্মান ও ভক্তি করিয়া থাকে এবং তাহাদের মন যোগাইবার চেষ্টা করে। এই সমস্তই ভ্রমবিশ্বাস ও অজ্ঞানতার কারণে হইয়া থাকে।

অসৎ-স্বভাবী আবিদের ভ্রম—এই শ্রেণীর আবিদগণ প্রকাশ্যভাবে সকল সৎকার্যই করিয়া থাকে; যেমন– প্রত্যহ রাক'আত নফল পড়ে, হাজার তস্‌বীহ পড়ে, সমস্ত রাত্রি জাগিয়া ইবাদত করে এবং প্রত্যহ রোযা রাখে। কিন্তু কুপ্রবৃত্তি হইতে হৃদয় পবিত্র করিতে তাহারা যত্নবান হয় না। অতএব তাহাদের হৃদয় ঈর্ষা, রিয়া, অহংকার ইত্যাদি কুপ্রবৃত্তিতে পরিপূর্ণ থাকে। এই প্রকার আবিদ বদমেযাজী ও কর্কশ-স্বভাবী হইয়া থাকে। তাহারা অকারণে আল্লাহ্‌র বান্দাদের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিয়া থাকে। বোধ হয় যেন তাহারা প্রত্যেকের উপরই অসন্তুষ্ট হইয়া রহিয়াছে। তাহারা মনে করে না যে, বদমেযাজ সকল ইবাদত বিনাশ করিয়া ফেলে এবং খোশমেযাজ সকল ইবাদত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বদমেযাজী আবিদগণ ইবাদত করিয়া মনে করে যেন অপর লোকের কিছু উপকার করা হইল। তাহারা ইবাদত করিয়া অন্য লোককে ঘৃণার চক্ষে দেখে এবং অপর লোকের ছোঁয়াচ লাগিবে ভাবিয়া সযত্নে দূরে থাকে। তাহাদের জানা উচিত যে, রাসূলে মাক্‌বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ আবিদ ও পরহেযগার হওয়া সত্ত্বেও সর্বদা প্রসন্ন বদনে হাসিমুখে সকলের সহিত মিশিতেন। যে নিতান্ত দীনহীন মলিন ব্যক্তিকে লোকে তাহাদের ত্রিসীমায় আসিতে দিত না তিনি তাহাকে তাঁহার পার্শ্বে বসাইতেন এবং অগ্রে স্বীয় পবিত্র হস্ত মুসাফাহার (করমর্দনের) জন্য সেই ব্যক্তির হস্তে স্থাপন করিতেন। যে ব্যক্তি জগতের শিক্ষাগুরু হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম অপেক্ষা পবিত্রতা ও পরহেযগারী বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিবে বলিয়া কল্পনা করে, সে নিতান্ত নির্বোধ। এই শ্রেণীর আবিদগণ শরীয়ত অনুযায়ী চলে বলিয়া দাবি করে বটে; কিন্তু তাহারা রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া থাকে। সুতরাং ইহা অপেক্ষা অধিক নির্বুদ্ধিতা আর কি হইতে পারে?

সূফীদের ভ্রম—সূফীগণই সর্বপেক্ষা অধিক গর্বিত ও ধোঁকায় পতিত হইয়া থাকে। কারণ, রাস্তা যত সূক্ষ্ম ও উদ্দেশ্য যত প্রিয় হয়, ধোঁকা ও সন্দেহ সেই রাস্তায় তত অধিক আসিয়া পড়ে। সূফীদের প্রাথমিক ধাপে উন্নীত ধর্ম-পথযাত্রীদিগকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে।

প্রথম শ্রেণী—তাহাদের প্রবৃত্তি ও রিপুসমূহ পরাস্ত ও পরাভূত হইয়া থাকে। এই অবস্থায় বাসনা-কামনা, লোভ-লালসা, ক্রোধ প্রভৃতি সমূলে উৎপাটিত না হইলেও ইহাদের কোন স্বাধীন ক্ষমতা থাকে না; শরীয়তের নির্দেশ ব্যতীত তখন ইহারা কোন কর্মেই প্রবৃত্ত হয় না। কোন দুর্গ অধিকৃত হইলে বিজেতা যেমন দুর্গবাসিগণকে হত্যা না করিয়া সর্বতোভাবে বশীভূত করিয়া রাখে তদ্রূপ সূফীর হৃদয়-দুর্গ শরীয়তরূপ বাদশাহ্‌র অধিকারে আসিলে হৃদয়ের প্রবৃত্তিসমূহ ইহার আজ্ঞাধীন হইয়া পড়ে।

দ্বিতীয় শ্রেণী—এই শ্রেণীর সূফীর দৃষ্টি হইতে ইহকাল ও পরকাল লোপ হইয়া যায়। ইহার অর্থ এই যে, সে তখন অনুভব ও কল্পনার রাজ্য অতিক্রমপূর্বক পরপারে চলিয়া যায়। কারণ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও কল্পনাগম্য বস্তু শুধু মানুষের সহিত সীমাবদ্ধ নহে, বরং পশুদের বেলায়ও ইহা সমভাবে থাকে। আর এই প্রকার বস্তু চক্ষু, উদর ও কাম-প্রবৃত্তির উপভোগ্য হইয়া থাকে। বেহেশ্‌তও কল্পনারাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। যাহারা সুমিষ্ট হাল্‌ওয়া ভোগ করিয়াছে তাহাদিগকে শুষ্ক তৃণ আহার করিতে দিলে ইহা যেমন হেয় ও তুচ্ছ হইয়া পড়ে। এই জন্যই তাঁহারা বেহেশতের নিমিত্তও লালায়িত হন না। তাঁহারা মনে করেন যে, সোজা ও সরলপ্রাণ লোকেরাই বেহেশতের লোভে ভুলিতে পারে। এইজন্য উক্ত আছে–

اَكْثَرُ اَهْلِ الْجَنَّةِ الْبُلْهُ

"অধিকাংশ বেহেশ্‌তবাসীই সোজা ও সরল।"

তৃতীয় শ্রেণী– এই শ্রেণীর সূফীকে আল্লাহ্ অপার সৌন্দর্য ও মহত্ত্ব একেবারে বেষ্টন করিয়া থাকে। বেহেশ্‌ত ও বাড়ীঘর, অনুভব ও কল্পনার সমস্ত সম্পর্ক তাহা হইতে সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হইয়া যায়। চক্ষু যেমন শব্দ শুনিতে পায় না, কর্ণ যেমন বর্ণ দেখিতে পারে না, এই শ্রেণীর সূফীও তদ্রূপ কল্পনা ও ইন্দ্রিয় দ্বারা কোন কিছু অনুভব করিতে পারেন না। অর্থাৎ তিনি তখন ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তু হইতে উদাসীন হইয়া যায়। এই সোপানে উপনীত হইলে সূফী সবেমাত্র দরবেশীর পথে পদস্থাপন করিয়াছেন বুঝিতে হইবে। ইহা ছাড়া এই শ্রেণীর সূফীর সহিত তখন মহাপ্রভু আল্লাহ্‌র যে সম্বন্ধ ঘটে, তাহা বর্ণনাতীত। কেহ এই সম্বন্ধকে একত্ব, কেহ বা হুলুল[১] নামে অভিহিত করিয়াছেন। পরিপক্ক ও গভীর জ্ঞানে অনভিজ্ঞ সূফী এইরূপ কোন অবস্থা প্রাপ্ত হইলে তিনি তাহা বর্ণনা করিতে পারেন না। তিনি এই সম্বন্ধে যাহা কিছু প্রকাশ করেন তাহা অপরের নিকট পরিষ্কার কুফ্‌রী কথা বলিয়া প্রতীয়মান হয়; অথচ তিনি প্রকৃত সত্য কথাই বলিবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু তিনি ইহা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারেন না। এই পর্যন্ত যাহা বর্ণিত হইল তাহা সুফীদের পথের একটি ছায়ামাত্র।

১. দুই বা ততোধিক দ্রব্যের এইরূপ মিশ্রণকে হুলুল বলে যাহাতে মিশ্রিত দ্রব্যসমূহকে কিছুতেই পৃথক করা চলে না। – অনুবাদক

বেশভূষা ও আচরণ সূফীদের ভ্রম—প্রিয় পাঠক, অনুধাবন কর, সূফীগণ কিরূপ ধোঁকায় নিপতিত রহিয়াছে। তাহাদের কেহ কেহ সুফীদের জায়নামায ও দরবেশী পরিচ্ছদ ব্যতীত আর কিছুই পায় নাই এবং তাহারা সূফীদের বেশভূষা ধারণপূর্বক সূফী সাজিয়া বসিয়াছে। তাহারা প্রকৃত সূফীদের ন্যায় দরবেশী-গদিতে উপবেশনপূর্বক গ্রীবা অবনত করত নিজদিগকে সূফী মনে করিয়া মাথা নাড়াইতে থাকে। আর এইরূপ আচরণকেই তাহারা দরবেশীর চূড়ান্ত বলিয়া ধারণা করিয়া বসিয়া রহিয়াছে। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার সূফীদের বাহ্য বেশ-ভূষাও অবলম্বন করিতে পারে নাই। বরং তাহারা সুন্দর-সুন্দর পরিচ্ছদ ও সূক্ষ্ম নীল রঙ্গের লুঙ্গী পরিধান করত মনে করে– আমরা গৈরিক বসন পরিধানপূর্বক সম্পূর্ণরূপে সূফী হইয়া পড়িয়াছি। তাহারা ভাবিয়া দেখে না যে, গৈরিক বস্ত্র শীঘ্রই মলিন হয় না এবং ইহা বারবার ধৌত করিতে হয় না। বলিয়াই সূফীগণ তদ্রূপ বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত ধর্ম-পথের আপদে জড়িত হইয়া সূফীদের হৃদয়ে যে কষ্ট ও যাতনা রহিয়াছে, ইহার প্রতীক স্বরূপ তাঁহারা নীলাভ বস্ত্র পরিধান করেন। কিন্তু কৃত্রিম সূফীগণ এমন কোন চিন্তায় আবদ্ধ নহে যে, তাহাদের বস্ত্র ধৌত করিয়া লইবার অবসর মিলে না; তাহারা ধর্ম-পথের আপদেও নিপতিত নহে যে, তজ্জন্য শোক প্রকাশক বস্ত্র পরিধান করিবে, অথবা তাহারা এমন নিঃস্ব ও নিঃসম্বল নহে যে, ছিন্ন বস্ত্রে তালি লাগাইয়া দরবেশদের ন্যায় পোশাক পরিধান করিবে। তাহারা স্বেচ্ছায় নতুন বস্ত্র ছিন্ন করত তালি লাগাইয়া দরবেশী পোশাক তৈয়ার করিয়া লয়। সুতরাং এই হতভাগাগণ বাহ্যিক অবস্থায়ও প্রকৃত সূফীদের সাদৃশ্য লাভে সমর্থ হয় নাই। সর্বপ্রথম হযরত উমর রাযিআল্লাহু আন্‌হু তালিযুক্ত বস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন। তাঁহার বস্ত্রে চৌদ্দটি তালি ছিল এবং বস্ত্রের অভাবে ইহাদের কয়েকটি পুরাতন চর্ম দ্বারা লাগানো হইয়াছিল।

কৃত্রিম সুফীদের মধ্যে এমন লোকও আছে যাহারা লজ্জাবশত যেমন অপ্রশস্ত ও জীর্ণ বস্ত্র পরিধান করিতে পারে না তদ্রূপ সর্বপ্রকার ফরয কার্য করিবার এবং পাপ হইতে বিরত থাকিবার ক্ষমতাও তাহাদের থাকে না। তদুপরি অতীব আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তাহারা যে শয়তান ও কুপ্রবৃত্তির শৃংখলে আবদ্ধ রহিয়াছে, তাহাদের এই অসহায়ত্ব এবং ত্রুটিও তাহারা স্বীকার করে না। অথচ তাহারা বলে– "হৃদয়ের সহিত কার্যের সম্বন্ধ। প্রকাশ্যে কাজ করিয়া লোককে দেখাইলে কি লাভ?" তাহারা আরও বলে– "আমার হৃদয় সর্বদা নামাযে রত আছে; আল্লাহ্‌র নিকট সর্বদা গোপন প্রার্থনা জানাইয়া থাকি। প্রকাশ্য নামায, রোযা ইত্যাদি ইবাদতের কি দরকার? যাহারা কুপ্রবৃত্তির বন্ধনে আবদ্ধ তাহাদের জন্যই এই প্রকাশ্য নামায-রোযা। কঠোর সাধনায় আমার প্রবৃত্তি মরিয়া গিয়াছে। আমার ধর্ম 'দহ্ দর দহ্' জলাশয়তুল্য; কোন অপবিত্রতাই ইহাকে কলুষিত করিতে পারে না।" তাহারা অপরকে ইবাদত করিতে দেখিয়া বলে– "এই হতভাগাগণ বৃথা পরিশ্রম করিতেছে।" আলিমগণকে দেখিয়া তাহারা বলে– "তাহারা কিতাবী কথায় গোলমালে আবদ্ধ রহিয়াছে; হাকীকত (প্রকৃত

তত্ত্ব) কিছুই বুঝিতে পারে নাই।" এই শ্রেণীর ভণ্ড সূফীদিগকে হত্যা করা (রাষ্ট্রের পক্ষে) অবশ্য কর্তব্য। সর্ববাদীসম্মত মতে তাহাদিগকে হত্যা করা নির্দোষ।

কেহ কেহ প্রকৃত সুফীদের খেদমতে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু তাহাদের জানা উচিত যে, নিঃস্বার্থভাবে এই সকল সূফীর খেদমত করিলে, স্বীয় জানমাল তাঁহাদের জন্য উৎসর্গ করিয়া দিলে এবং তাঁহাদের ভালবাসায় নিজকে ভুলিয়া গেলে পরম সৌভাগ্য লাভ করা যায়। অপরপক্ষে এমন কতক লোক আছে, যাহারা ধন ও সম্মান-লালসায় তাঁহাদের নিকট মুরীদ হয়; নিজকে সূফীর খাদেমরূপে পরিচয় দিয়া লোকের ভক্তি-শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে এবং হারাম-হালালের ভেদাভেদ না করিয়া ধন পাইলেই সংগ্রহ করে। এইরূপে তাহারা প্রসার লাভ করিতে চায়। তাহারা নিতান্ত ধূর্ত ও প্রবঞ্চক।

কতক সূফী কঠোর সাধনায় ধর্ম-পথযাত্রী সকল সোপান অতিক্রম করত স্বীয় প্রবৃত্তিকে বশীভূত করিয়া লন এবং নিজকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র নিকট উৎসর্গ করিয়া দিয়া নির্জন কক্ষে অবস্থান করেন। তখন তাঁহাদের কাশ্‌ফ হইতে থাকে। এমন কি কোন পদার্থের সংবাদ জানিতে চাহিলে তাঁহারা ইহা প্রত্যক্ষ দেখিতে পান এবং তাঁহাদের কোন ত্রুটি হইলে মহাপ্রভু আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে তাঁহাদেরকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হয়। কখন কখন তাঁহারা নবী ও ফেরেশতাগণকে সুন্দর-সুন্দর আকৃতিতে দেখিয়া থাকেন এবং নিজকে আকাশমণ্ডলে দেখিতে পান। এই সকল দৃশ্য যদি প্রকৃত সত্য হয়, তবে ইহাদের মর্যাদা সঠিক স্বপ্নের সমান। নিদ্রিত ব্যক্তির কল্পনায় যেরূপ স্বপ্ন ঘটে জাগ্রত রুগ্ন ব্যক্তিরও কখন কখন সেরূপ অবস্থা ঘটিয়া থাকে। তখন এই শ্রেণীর সুফী ধোঁকায় পড়িয়া বলে যে, ভূতল ও নভোমণ্ডলে যাহা কিছু আছে তৎসমুদয়ই তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইয়াছে এবং উহাকেই তিনি আধ্যাত্মিক উন্নতির চরম বলিয়া গণ্য করেন; অথচ আল্লাহ্‌র সৃষ্টিতে যত বিশেষত্ব ও সৌন্দর্য রহিয়াছে, যত আশ্চর্য কার্য অহরহ চলিতেছে, উহার বিন্দুমাত্রও সে জানিতে পারে নাই। কিন্তু তদ্রূপ সূফী সৃষ্টির সবকিছু জানিয়েছেন, দেখিয়েছেন বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করেন এবং নিজকে আধ্যাত্মিক উন্নতির চরম শিখরে উপনীত ভাবিয়া অধিকতর উন্নতির চেষ্টা ছাড়িয়া দেন। এমনও হইয়া থাকে যে, এতদিন যে সকল কুপ্রবৃত্তি বশীভুত ও পরাভূত ছিল, সুযোগ বুঝিয়া ইহারা আবার বলবান হইয়া উঠে। তিনি আরও মনে করেন– "আমি যখন এমন অদ্ভুত ব্যাপার দেখিতে পাইতেছে, তখন আমার প্রবৃত্তি সম্পূর্ণরূপে আজ্ঞাবহ হইয়া পড়িয়াছে; আর কখনও কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না।" ইহা অতি বিষম ক্ষতিকর আত্ম-প্রবঞ্চনা। নিজের অবস্থার প্রতি নির্ভর করিয়া সাধক কখনও স্থিতিশীল হইতে পারে না। কিন্তু তাঁহার অবস্থা যখন এইরূপ হইয়া দাঁড়ায় যে, সাধনার প্রভাবে তাঁহার প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইয়া যায় এবং শরীয়তের আদেশানুসারে চলিতে তাঁহার আনন্দ হয় ও আচার-ব্যবহারে তিল পরিমাণও ত্রুটি না ঘটে, তখন হয়ত তাঁহাকে প্রবৃত্তির অনিষ্টকারিতা হইতে নিরাপদ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

হযরত শাইখ আবুল কাসিম গুরগানী রাহ্‌মাতুল্লাহি আলায়হি বলেন– "পানির উপর দিয়া চলা, বাতাসে উড়া, গোপন বিষয়ের সংবাদ বলা কোনই কারামত (অলৌকিক কার্য) নহে। বরং নিজকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র আদেশে পরিচালিত হইবার অভ্যস্ত করিয়া তোলাই প্রকৃত কারামত। অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে ও আর্থিক বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে শরীয়তের আজ্ঞাবহ হইয়া যাওয়া এবং কখনও শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণ না করাকেই কারামত বলে। কেহ এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে ইহার উপর নির্ভর করা চলে। শয়তানের সাহায্যেও পানির উপর দিয়া চলা এবং বাতাসে উড়া যাইতে পারে। শয়তানও অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত আছে। আবার বেঈমান গণক-যাদুকরগণও গুপ্ত বিষয়ের সংবাদ দেয় এবং তাহাদের মাধ্যমে বিস্ময়কর ঘটনাবলীও প্রকাশ পাইয়া থাকে। সুতরাং এবং বিধ অলৌকিক কার্যাবলী বুযুর্গির নিদর্শন নহে। বরং নিজের অস্তিত্বও আমিত্ব একেবারে ভুলিয়া গিয়া কুপ্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণরূপে আজ্ঞাবহ করত শরীয়তের আদেশ অনুসারে চলিবার অভ্যাস পরিপক্ক করিয়া লওয়াকেই বুযুর্গি বলে। এইরূপে উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইলে ব্যাঘ্রপৃষ্ঠে আরোহণ করিতে না পারিলেও কোন ক্ষতি নাই। কারণ, তুমি তোমার হৃদয়মধ্যস্থ ক্রোধরূপ ব্যাঘ্রকে পদদলিত করিয়া বশীভূত করিতে পারিয়াছে। অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদ দিতে না পারিলেও কিছু আসে যায় না; কেননা কুপ্রবৃত্তির প্রতারণা সম্বন্ধে সম্যকরূপ অবগত হওয়াই তোমার পক্ষে অদৃশ্য বিষয়ে অভিজ্ঞ হওয়ার তুল্য। পানির উপর দিয়া চলিতে ও বাতাসে উড়িতে না পারিলেও কোন ক্ষতি নই; কারণ, তুমি অনুভব ও কল্পনার সীমা অতিক্রম করত এমন অবস্থায় উপনীত হইয়াছ এবং এমন উচ্চ স্থানে বিচরণ করিতেছ, যাহা পানির উপর দিয়া চলা এবং বাতাসে উড়ার তুল্য। এক রাত্রে বিস্তৃত জঙ্গল ও দুর্গম মরুপথ অতিক্রম করিতে না পারিলেও কোন সংশয়ের কারণ নাই; কেননা তুমি যখন সংসারের মরীচিকাপূর্ণ মরুভূমি ও কুপ্রবৃত্তিরূপ কন্টকপূর্ণ বন-জঙ্গল পার হইতে পারিলে এবং পার্থিব সকল বিষয় পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিতে পারিলে, তখন তুমি অতি বিস্তৃত ময়দান ও অতি গভীর বন-জঙ্গল অতিক্রম করিয়া গিয়াছ। নিমিষে পাহাড়-পর্বত অতিক্রম করিতে না পারিলেও কিছু আসে যায় না; কারণ, তুমি যে সন্দেহযুক্ত ধনে পদাঘাত করিয়া পলায়ন করিতে পারিয়াছে, ইহাই তোমার পক্ষে পাহাড়-পর্বত উত্তীর্ণ হওয়া। কারণ, মহাপ্রভু আল্লাহ্‌ ধর্ম-পথযাত্রীর এই সকল বিপদসংকুল স্থানকে দুর্গম গিরিসংকট বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সাধক সূফীদের ভ্রম-বিশ্বাসে ধোঁকায় পতিত হওয়ার কতিপয় দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল। বিস্তৃত বিবরণ দিতে গেলে গ্রন্থের কলেবর অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে।

ধনীদের ভ্রম-বিশ্বাস—ধনীদের মধ্যেও বহু লোক মন্দকে ভাল ও ভালকে মন্দ জ্ঞানে ধোঁকায় পড়িয়া রহিয়াছে। তাহারা হারাম উপায়ে অর্জিত ধন মসজিদ ও পান্থশালা নির্মাণ-কার্যে ব্যয় করিয়া থাকে এবং ইহাকে অতীব পূণ্যের কাজ বলিয়া মনে করে। হারাম উপায়ে অর্জিত ধন ইহার প্রকৃত অধিকারীকে ফেরত দেওয়া অবশ্য

কর্তব্য। কারণ, এইরূপ ধন সৎকার্যে ব্যয় করিয়া সওয়াব পাওয়ার আশা ত দূরে থাকুক, বরং ইহাতে বহু পাপ হইয়া থাকে।

রিয়ার বশবর্তী হইয়া ধন ব্যয়—কতিপয় ধনী ব্যক্তি আবার হালাল উপায়ে অর্জিত ধন তদ্রূপ সৎকার্যে ব্যয় করে। কিন্তু ইহা দেখিয়া যেন লোকে তাহাদিগকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করে, ধন ব্যয়ের ইহাই একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে। একটি মুদ্রা ব্যয় করিয়াই তাহারা চায় যে, প্রস্তরফলকে নিজেদের নাম খোদিত করত মসজিদ বা পান্থশালায় লাগাইয়া দেওয়া হউক। এমন ব্যক্তিকে যদি বলা হয় যে, সর্বজ্ঞ আল্লাহ্ ত নির্মাণকারীকে ভালরূপে জানেন; কাজেই প্রস্তরফলকে নাম খুদিয়া লাগাইবার প্রয়োজন হইলে অপর লোকের নাম লাগাও, তবে কখনও সে সম্মত হইবে না। পাড়া-প্রতিবেশী যখন অনাহারে কষ্ট পাইতে থাকে, তখন তাহাদিগকে ধন দানে বিরত থাকিলেই এই প্রকার রিয়ার পরিচয় পাওয়া যায়। পাড়া-প্রতিবেশীর অভাব মোচনার্থ ধন দান করা উত্তম ও অতি পূণ্যের কাজ। কিন্তু দীন-দুঃখী পাড়া-প্রতিবেশীর অভাব মোচনে ধন ব্যয় না করিয়া মসজিদ, পান্থশালা প্রভৃতি নির্মাণ কার্যে মুক্ত হস্ত হওয়ার কারণ এই যে, তাহাদের দুঃখ-দরিদ্রতা মোচনে ব্যয় করিলে প্রস্তরফলকে তদ্রূপ কোন প্রশংসার কথা খোদিত করিয়া তাহাদের পোড়া কপালে লাগানো যাইবে না।

মসজিদের সৌষ্ঠব বর্ধনে অতিরিক্ত ব্যয় অসঙ্গত—কতিপয় ধনী ব্যক্তি বিশুদ্ধ নিয়তে ধন ব্যয় করে বটে কিন্তু মসজিদের সৌষ্ঠব বর্ধন ও নানারূপ বিচিত্র কারুকার্যে ব্যয় করিয়া তাহারা মনে করে- "বড় পূণ্য কাজ করিলাম।" অথচ এইরূপ কার্যে দুই প্রকার অনিষ্টের উদ্ভব হয়। **প্রথম**- নানারূপ বিচিত্র কারু-কার্য-খচিত মসজিদে নামায পড়িবার সময় নামাযীর মন সৌষ্ঠবের প্রতি আকৃষ্ট থাকে। **দ্বিতীয়**—মসজিদে চিত্র-বিচিত্র কারুকার্য দেখিয়া নিজ গৃহে সেইরূপ সৌষ্ঠব করিবার ইচ্ছা জন্মে। দুনিয়া তাহার নিকট অতি সুশোভিত ও সুসজ্জিত হইয়া উঠে এবং সে এই কারু-কার্যকে অতি আবশ্যক বলিয়া ধারণা করে। রাসূলে মাক্‌বওল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "তোমরা যদি মসজিদে চিত্র-বিচিত্র কারু-কার্য কর এবং কুরআন শরীফের উপর স্বর্ণ খচিত কর, তবে তোমাদের পক্ষে ইহা গভীর পরিতাপের বিষয়।" নামাযীগণ যদি বিনয়াবনত ও আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত-বিহবল হয় এবং তাহাদের মনে দুনিয়ার প্রতি ঘৃণা থাকে, তবেই মসজিদ সুসজ্জিত ও সুশোভিত হইয়া উঠে। বাহ্য কারুকার্য ইহার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিতে পারে না। আর যে বস্তু নামাযীর হৃদয় হইতে বিনয় ও ভয়-ভীতি বিদূরিত করে এবং দুনিয়াকে সুশোভিত করিয়া তোলে, ইহাই মসজিদকে উজার ও উৎছন্ন করিবার প্রকৃত উপকরণ। অথচ যে হতভাগা মসজিদকে বিচিত্র সৌষ্ঠবে সজ্জিত করিয়া উৎছন্নে ফেলিয়া সে মনে করিল- "আমি উত্তম কার্য করিলাম।"

ধন বিতরণে ভ্রম—কতক ধনী লোক স্বীয় গৃহদ্বারে ভিক্ষুক ও দরিদ্রদিগকে সমবেত করিয়া ধন বিতরণ করাকে নির্দোষ বলিয়া মনে করে। দেশে তাহাদের দানের সংবাদ পরিব্যপ্ত হউক, ইহাই তাহাদের উদ্দেশ্য থাকে। কেহ কেহ আবার বাক্‌পটু ও সুপরিচিত ভিক্ষুককে দান করিয়া থাকে, যেন সে দেশময় দাতার যশ গাহিয়া বেড়াইতে পারে। কেহ বা হজ্জ যাত্রীগণকে ধন দান করিয়া থাকে অথবা খানকাহে অবস্থিত দরবেশদিগকে অর্থ সাহায্য করিয়া থাকে। এমন দানের উদ্দেশ্য এই যে, বহু লোকে তাহাদের দানের সংবাদ পাইবে এবং তাহাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকিবে। এইরূপ দাতাগণকে যদি বলা হয়- "হজ্জ যাত্রীগণকে দান করা অপেক্ষা য়াতীমদিগকে গোপনে সাহায্য করিলে অধিক পুণ্য পাওয়া যাইবে; তুমি পিতৃমাতৃহীন অসহায় বালক-বালিকাদিগকে সাহায্য কর"- তবে তাহারা য়াতীমদিগকে দান করিবে না। কারণ, লোকমুখে প্রশংসা গান শুনিলে তাহারা খুব আনন্দ উপভোগ করে এবং তদ্রূপ কার্যে অর্থ সাহায্য করিয়া মনে করে- "মহাপুণ্যের কাজ করিলাম।"

এক ব্যক্তি হযরত বিশরে হাফীর (র) নিকট আবেদন করিল- "আমার নিকট দুই সহস্র মুদ্রা আছে। আমি হজ্জে যাইতে চাই।" তিনি বলিলেন- "তুমি কি খেলতামাশা দেখিতে চাও? না আল্লাহ্‌র প্রসন্নতা লাভ করিতে চাও?" সেই ব্যক্তি নিবেদন করিল- "গৃহে ফিরিয়া দশজন ঋণগ্রস্তের ঋণ পরিশোধ করিয়া দাও; দশজন য়াতীমকে বণ্টন করিয়া দাও বা বহু পরিবারবিশিষ্ট দরিদ্র মুসলমানকে দান কর। কেননা এক মুসলমানের মনে শান্তি প্রদান করা ফরয হজ্জ ভিন্ন শত হজ্জ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।" সেই ব্যক্তি আবার নিবেদন করিল- "হজ্জে যাইবার জন্য আমার প্রবল ইচ্ছা হইয়াছে।" তিনি বলিলেন- "ইহার কারণ এই যে, তুমি অকারণে এবং অবৈধ উপায়ে এই ধন উপার্জন করিয়াছ। সুতরাং ইহা অনুপযুক্ত স্থানে ব্যয় না করা পর্যন্ত তুমি শান্তি পাইবে না।"

যাকাত ও উশর প্রদানে ভ্রম—কতিপয় ধনী ব্যক্তি যাকাত এবং উশর ব্যতীত এক কপর্দকও ব্যয় করে না; আবার উহাও নিজের কারবার ও ব্যবসায়ে সংশ্লিষ্ট লোকদিগকে দান করিয়া থাকে। কেহ কেহ যেমন শিক্ষক ও ছাত্রগণকে দান করে; কারণ এই শ্রেণীর লোকগণ দাতার চারিদিকে ভিড় করিয়া থাকিলে তাহার সম্মান ও প্রতিপত্তি অটুট থাকে। কোন কোন স্থানে শিক্ষক স্বীয় ছাত্রগণকে যাকাত দিয়া থাকে; উদ্দেশ্য এই যে, ছাত্রগণ তাহার নিকট অধ্যয়ন করিবে। তাহারা যদি অধ্যয়ন না করে তবে তাহাদিগকে যাকাতও দেওয়া হয় না। এইরূপ দানকে এক প্রকার বেতন বলা চলে। শিক্ষকও জানে যে, শিষ্যত্বের বিনিময়ে তাহাদিগকে দান করা হইতেছে, অথচ মনে করে যে, যাকাত দেওয়া হইল। কোন কোন ধনী ব্যক্তি আবার বুযুর্গগণের খাদেমদিগকে যাকাত দান করে। আবার কখন কখন তাহাদের চেষ্টা ও অনুরোধে অপর লোককেও দিয়া থাকে এবং তাহাদের উপকার করিল মনে করিয়া গাহিয়া বেড়ায়। এই সামান্য যাকাত দানের বিনিময়ে সে বহু উদ্দেশ্য সাধন করিতে চায়।

কখন কখন লোকমুখে প্রশংসা গান ও সুখ্যাতির কথা শুনিবার লালসা হৃদয়ে জাগিয়া উঠে। অথচ তদ্রূপ উদ্দেশ্যমূলকভাবে দান করিয়াও মনে করে যে, যাকাত দেওয়া হইল।

যাকাত দানে বিমুখ সৎকাজে রত ধনীর ভ্রম—কতিপয় ধনী ব্যক্তি এমনও আছে যাহারা কখনই যাকাত দেয় না এবং কেবল ধন সঞ্চয় করিয়া রাখে। আবার তাহারা নিজদিগকে পুণ্যবান বলিয়া দাবি করে; সর্বদা রোযা রাখে এবং সমস্ত রজনী জাগ্রত থাকিয়া ইবাদত করে। এইরূপ ব্যক্তি এমন শিরোপীড়াগ্রস্ত রোগীর তুল্য যে, মাথার বেদনায় অস্থির, অথচ সে যথাস্থানে ঔষধ প্রয়োগ না করিয়া পায়ের গোড়ালিতে ঔষধ লাগায়। তদ্রূপ হতভাগা ধনী ব্যক্তি বুঝে না যে, সে কৃপণতারূপ ভীষণ রোগে আক্রান্ত। অতি ভোজনে এই রোগের উপশম হইবে না; বরং অধিক দানে ইহা উপশম হইবে। ধনীগণ এই প্রকার বহু ধোঁকায় পড়িয়া রহিয়াছে।

ধর্ম-পথযাত্রীর মুক্তির উপায়– উপরিউক্ত ভুল-ভ্রান্তি হইতে কেহই বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। তবে এই গ্রন্থে ইবাদতের আপদ, প্রবৃত্তির প্রবঞ্চনা, শয়তানের প্রতারণা প্রভৃতি বিষয়ে যে সমস্ত জ্ঞানগর্ভ কথা বর্ণিত হইয়াছে, তৎসমুদয় যে ব্যক্তি গভীর মনোনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করত শিক্ষানুযায়ী কাজ করিতে পারিয়াছে, যাহার হৃদয়ে আল্লাহ্‌র মহব্বত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে এবং যে অভাব মোচনের পরিমিত ধনে সন্তুষ্ট থাকিয়া দুনিয়াকে বিষবৎ বর্জন করিতে পারিয়াছে, যাহার হৃদয়ে মৃত্যুর চিন্তা সর্বদা জাগ্রত থাকে এবং যে সর্বদা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে, কেবল তেমন ব্যক্তিই ভ্রম-বিশ্বাস ও ধোঁকা হইতে বাঁচিয়া থাকিতে পারে। তবে পরম দয়ালু আল্লাহ্ যাহার জন্য সহজ করিয়া দেন, তাহার জন্যই উহা সহজ হইয়া থাকে।